

শান্তনু'র দিনকাল আর ভালো যাচ্ছিল না। সন্তর দশকের শূন্যের কিছু পর থেকেই এই ব্যাপার। আর সবাই তবু যাহোক গুঁছিয়ে টুঁছিয়ে নিচ্ছিল, সে কিছুতেই কিছু করতে পারছিল না। যে রেটে জিনিসের দাম বাড়ছে কুলোচ্ছে না, প্রাইভেটে ছাত্র পড়িয়ে যে কিছু রোজগার করবে, তারও আশা ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। এখন কেউ আর তেমন পড়তে আসে না। দরকার হয় না। পরীক্ষার হলে টোকাটুকি বেড়ে যাওয়ার পর থেকেই এই কান্ড। তাছাড়া প্রাইভেট টিউটর হিসেবে শান্তনু'র তো তেমন নাম নেই, সে যত শেখাতে পারে, তত পরীক্ষায় পাশ করাতে পারে না। এটা একটা এমন ঘটনা, কাগজে এ নিয়ে লেখালেখি হওয়া উচিত। তার ইচ্ছাও হয় লিখতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে না। তার তো ওই দোষ, কথা বলতে পারে ভালো, তার চেয়েও ভালো পারে ভাবতে, কিন্তু লিখতে বসলেই গায়ে জ্বর আসে। ভাগ্যিস, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই, না হলে ওই চিঠি লেখা নিয়েই একটা কিছু হয়ে যেত। গৌরী এসব ভালো পারে। এই যেমন চিঠি লেখা, কোনো কিছু টুকে রাখা, দরকারি কাগজ-পত্র ফাইলে রাখা। সে যে এককালে বন্ধু-বান্ধবের কবিতার বইয়ের পিছনের মলাটে দু-চারলাইন লিখত, সেটা এখন যাদু বলে মনে হয়।

মাঝে হঠাৎ গৌরী বেসে বসল, প্রতিদিনের খরচার হিসেব লিখতে হবে। কেননা মাসের ২০ তারিখেই টাকা ফুরিয়ে যাবে কেন? আর সবাই ধার না করে সংসার চালায়, তারাই বা পারবে না কেন? নিশ্চয় অপচয় হয় বা শান্তনু'র টাকা হারিয়ে ফেলে। তাই হিসেব হবে।

এজন্য গৌরী তাকে এমন এক সুন্দর নোটবুক কিনে দিয়েছিল যার সঙ্গে একটি ছোট পেনসিল চমৎকার বাঁধা থাকত। তবু পারেনি শান্তনু'র। ২/৪ দিন চলোছিল, তারপর যে-কে সেই।

শুধু তো এই নয় এর পরেও আছে। গৌরীর এক মাসতুতো ভাই এখানে, এই আসানসোলে খাদ্কা পলিটেকনিকে পড়ত। গৌরীর এই মাসী প্রায় কুবের বলা যায়। কিন্তু ছেলোট মোটেই ভালো না। এক ছেলে বা একমাত্র সন্তান বলেই হয়ত বাপ-মায়ের সেই সবেধন নীলমণি হওয়ায় সে ধরাকে সরা জ্ঞান করত। তাই সাতঘাটের জল খেয়ে ও পড়ে তার এই পলিটেকনিকে পড়তে আসা, বাস্তবিক টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরে দুলাল দেখার মতো মজা পেয়েছিল শান্তনু'র। বোধকারি সেটা তিন বছরের কোনো ডিপ্লোমা কোর্স ছিল; উনসত্তরে ভর্তি হয়েছিল। ভর্তি হবার সময় ওই কুবের মাসী মেসো খুবই ঘটা করে এসেছিল। সত্যি বলতে কী, সে সময়ে তার খুব খারাপ লাগে বরং দুহাতে খরচ করার ইমেজ রেখে তারা চলে গেলে, মনে আছে ভালো, শান্তনু'র

উৎসব শেষ হলে যেমন হয় তেমন ফাঁকা লেগেছিল। অবশ্য সে উৎসব যে নিষ্কণ্টক কোনো ফেস্টিভ্যাল, এটা ভাবলে ভুল হবে, কেননা তাতে কাঁটা ছিল। বিলম্বণ কাঁটা ছিল। কেননা এর তো রিটার্ন দিতে হবে। সে না দিক গৌরী তো দেবেই। তার এই ফাঁকা পকেটে সেই রিটার্ন দেওয়া হবে আরেক বোঝা, শুদ্ধ শাক ভাত খাওয়ালেও, সে শাকের আঁটি বোঝার উপর তাকে বিপদে ফেলবে। হ'লও তাই। সপ্তাহে প্রতি শনিবার ধাদ্কায় ফোন ওই দুলালকে। রবিবার এসো। যার অর্থ চর্ব-চোষ খাও। ফাটা পকেট ফুটো করে দাও। কিন্তু ভাগ্য ভালো, সব রবিবার সেই দুলাল আসত না। কেননা রবিবারে কোন দুলাল আর এ বাড়িতে আসতে চায়। এ বাড়িতে রবিবারে অ্যাডভান্স কেনা সিনেমার টিকিট থাকে না, রেডিও থাকলেও, তাতে সিলোন থাকে না। কাগজ থাকলেও স্পোর্টস বা মন্ডির কোনো ন্যাগাজিন থাকে না। কেন আসবে প্রতি রোববার শুদ্ধ খেতে? যা সে, দুলাল, জীবনভোর বিস্তর খেয়েছে। কিন্তু ওই ঘন ঘন না আসা যে একদিন এভাবে পুঁথিয়ে নেবে দুলাল, কে জানত?

তখন ১৯৭০। দেশজুড়ে নকশালবাড়ি থেকে বিপ্লবের দাবানল একদিন শান্তনুকে বিপদে ফেলে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। হায় সেই সময়, যখন জিনিসের দাম বাড়ছে, যখন তার পকেটে পয়সা নেই, যখন তার হাতে টিউশনি নেই তখন সেই মহা আকালে এরকম দাবানল শান্তনুকে দগ্ধ করল। সে এ. বি. টি. এ.-র মেম্বার হয়ে সি. পি. এম.-এর কাছাকাছি ছিল বলে এরকম ভাবছে তা না। তবে হ'ল কী, সেই দুলাল দাবানলের ভয়ে কেঁচো হয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় নিল তার বাড়িতে। শূদ্ধ হল শান্তনুর সমস্যা। সে কি কেবল একধরনের? নানা ধরনের সমস্যা। ক্রমে এই সমস্যা হায়দ্রার মাথার মতো বহুমুখী হ'ল। এক. ওই দুলাল তাদের বাড়িতে পাকাপাকি থাকতে লাগল। তার সকালে ডিমসেদ্ধ চাই, পাউরুটি-মাখন তো চাই-ই। সন্ধ্যায় তার আবার স্নান করা চাই। এই জলকণ্টের আসানসোলে যে সে কী বিলাস, এ ভুক্তভোগী ছাড়া, খরায় অক্লান্ত অঞ্জল ছাড়া, গোবি-সাহারা ছাড়া আর কে বুঝবে! তার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে প্রত্যহ বেরিয়ে রাত ১০টায় ফেরা ও ফিরেই গরম গরম ডিনার, একি চাটখানি কথা? শান্তনুর ফাঁকা পকেট ফুটো হওয়া দূরের কথা, বলা উচিত তার পকেট থাকাই বাহুল্য হয়ে গেল। কেননা মাসের দশ বারোদিন পর তার পকেটে কিছু থাকতো না। আগে তবু ২০/২২ তারিখ আশি থাকত। দুই. সব সময় গৌরীর এই দুলালের জন্য ব্যস্ত-সমস্ত ভাব তার অসহ্য লাগত। সে মাথা ঠিক রাখতে পারত না। গৌরীর সঙ্গে ক্রমে তার কথা কাটাকাটি শূদ্ধ হ'ল। তিন. তাদের বাড়িতে আসলে একটিই ঘর যা শোবার ঘরের মতো মাপে কিছু বড়। বাকি আছে ভাড়ার ঘর, যা খুবই ছোট। সে ঘরে একজন শোবার মতো একটি চৌকি ছাড়া দুটি আলমারি মাত্র রাখা যায়, তারপর আর জায়গা থাকে না। ওইখানেই এক আলমারির উপর কেরোসিন স্টোভ আছে, যেখানে চা ও

এমার্জেন্সি রান্না হয়। যে কারণে ঘরটির ছাদ ও একদিককার দেয়াল কিছন্ন কালচে। এই ঘরে একা গোরী শুনত। যার জন্য টুইনস্ আনন্দ পেতে শান্তনুকে নানা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করতে হ'ত। যা সর্বদাই নিশ্চিতের ও সুখের হ'ত না। বড় ঘরে দুটি সিঙ্গল খাট, যা এককাল জোড়া থাকত, ওই দুলালের সৌজন্যে আলাদা করা হ'ল। তার একটাতে সে ও অপরটাতে ওই দুলাল শুনত। এ বড় অসহ্য, এই যুবক নিয়ে শোয়া যে আবার মাঝরাতে মশারির বাইরে গিয়ে জানলার ধারে বসে সিগারেট খেত, যা একপ্রকার তার নিদ্রাকে অজুহাত করলেও তার জাগ্রত তন্দ্রাকে অসম্মানই করত বলা যায়। চার. যদিও এই দুলাল নকশালদের খতম অভিযানে ভয় পেয়ে ও নিজেকে বাস্তবিক প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধে তার আদরে পিঠের চামড়া বাঁচাতে ধাক্কা ছেড়ে তার ঘাঁটিগলির ফ্ল্যাটে এসেছিল, তবু সে যে আবার তলে তলে ওই নিজেকে বাঁচাতেই নকশালদের তোষামোদ করত, এটা শান্তনু প্রথম প্রথম আদৌ বুঝতে পারত না। একদিন হ'ল কী, রাত্রি ১০টার আড়া-ফাড়া মেরে ওই দুলাল এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এল। জানাল, বন্ধু এখানে থাকবে ও থাকে। বন্ধুর ছিমছাম চেহারা, দামি জামা-কাপড় দেখে গোরী দূরে থাক শান্তনুরও আদপে কোনো সন্দেহ জাগেনি। গোরীর কথামতো দুই বন্ধুকে তাদের একমাত্র শোবার ঘর ছেড়ে সে ও গোরী সহজেই দুজনে ভাড়ার ঘরের সিঙ্গল চোঁকিতে কণ্টে-সুণ্টে শুল। কণ্টে-সুণ্টে বললে একান্তই ভুল বলা হবে, কেননা ওইদিন শান্তনু গোরীকে নিয়ে আনন্দ করেছিল। কিন্তু এই আনন্দেরও শেষটা সৈদিন তেমন জমেনি। গোরী এসবের পরে ভালোই যুগ্মোতে পারে কিন্তু শান্তনু সেরকম যুগ্মোতে পারে না। উপরন্তু দু-বন্ধু সৈদিন সারারাত জেগে গল্প করে তাকে খুব ডিসটার্ব করেছিল। সৈদিনও শান্তনু কিছু বোঝেনি, কেননা তাদের কথাবার্তা এ ঘর থেকে আক্ষরিক বুঝতে পারেনি সে। বোঝা যায়ও না। বুঝেছিল, অপরদিন পরে এবং বলা বাহুল্য আরেক রকমের বিপদে পড়েছিল। সৈদিন কী একটা ব্যাপার ছিল। স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। বেলা প্রায় বারোটা হবে, শান্তনু ফিরেছিল ছুটির মেজাজে। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই পাড়ার পিওন তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল একটি প্যাকেট। সাদা কাগজে চমৎকার প্যাক। তাতে প্রায় মঙ্গোলীয় হস্তাক্ষরে দুলালের ঠিকানা লেখা। প্রেরকের কোনো ঠিকানা নেই। সেখানে আবছা রবার স্ট্যাম্পে মৃদুদিত আছে নেপালের বিরাটনগরের ইল্লিজবল্ কোনো এক পুস্তক ভান্ডারের ছাপ। যা দেখে বুঝতে আর বাকি থাকে না যে এই প্যাকেটে বই আছে। এই একটা ব্যাপার অর্থাৎ বই যা শান্তনুকে কখনও চিন্তিত করে না, যেজন্য নিতান্ত সাদামাটা বাহক হয়েই প্যাকেটটি গোরীর হাতে তুলে দেবার সময় সে স্বয়ং শান্তনু-সুলভ রসিকতা করে বলোঁছিল, এই নাও শালার বই। গোরীর দিকে সে সচরাচর তাকায় না। কিন্তু রসিকতার জন্যই হোক বা অকারণেই হোক সে সৈদিন মুখের দিকে কেন যেন তাকিয়েছিল। দেখেছিল যে গোরী প্যাকেটটি নেবার সময় অথবা তাড়াহুড়ো

করল ও অসম্ভব সম্ভ্রান্ত লাগল তার মুখ। কিন্তু ওইটুকু হ'লেও না হয় কথা ছিল। ভাবা যেত, দুলালের প্রতি তার এলার্জি বলে গোরী দুলাল সংক্রান্ত যে কোনো ব্যাপারে কমপ্লেক্সে পড়ে। কিন্তু গোরী আরও কিছু করল, বলল,

—তুমি কোথায় পেলো এই প্যাকেট? কে দিল?

—কেন পিওন, যার দেবার কথা?

—ও, পিওন, তাই বল!

বুঝতে বাকি থাকেনি শান্তনুর, গোরী শেষ অর্ধ ভালোই সামলে নিল। সন্দেহের কাঁটা অনেক আগের থেকেই তার কপাল পরেন্ট করে এগুঁছিল, এখন প্রকৃত বিপদ হ'ল। অবশ্য সে বোকার মতো তখন অন্তত ভেবেছিল, এসব সিনেমা-টিনেমার কাগজ হবে, যা সে পছন্দ করে না। ব্যাপারটা তাই হ'লেই বোধহয় ভালো ছিল, অন্তত শান্তনু তো বিপদে পড়ত না। কিন্তু ব্যাপারটা তা হ'ল না। তা হ'তে পারেও না। কেননা সে নেহাতই বোকা, আগে বোঝেনি যে নেপালের বিরাটনগর থেকে ওই সত্তরে সিনেমা সংক্রান্ত কাগজ আসতে পারে না, অন্য কোনরকমও কাগজ আসতে পারে না, একমাত্র আসতে পারে পিকিঙে ছাপা, হয় পিকিঙ রিভিউ, নয় সি. পি. সি. বা চেয়ারম্যান মাও-এর বুলেটিন বা ডকুমেন্ট। আর সেগুঁলি কিছুদিন পড়ে থাকত তাদের সবচেয়ে নোংরা জারগা বাথরুমের পাশে, যেখানে তাদের এক চিলতে প্যাসেজের শেষ ও যেখানে কয়লা-ঘুঁটে রাখা হ'ত, রাখা হ'ত সংসারে যা রাখা যায় না অথচ যা তৎকালে ফেলাও যায় না, যেমন শিশি-বোতল, ফুটো ড্রাম বা বালতি, পুরনো জুতো যা কোনো কারণে বেথাপ্পা অথচ অটুট, কিছু বই কাগজ যেমন পুরনো 'দেশ', যা থাকত একটি ডালাভাঙা টিনের স্ল্যাকসে। সেখানে একদিন ওই প্যাকেট ওই টিনের স্ল্যাকসেই, হয়, পুরনো 'দেশ'গুঁলির ভিড়ে পড়ে থাকতে দেখল। এই সেই পুরনো 'দেশ' পত্রিকা, যা নিয়ে শান্তনুর সেই অবিষ্মরণীয় ঠাট্টা, একদিন এই 'দেশ'র সাপ্তাহিক ভিড়ে আমাদের স্নেহের মিডলক্লাস ঢাকা পড়ে যাবে; কেননা মাটির দেশ তবু ছাড়তে পারে এই মিডলক্লাস কিন্তু কাগজের 'দেশ' প্রাণ ধরে ছাড়তে, বেচতে বা পোড়তে পারে না কেউ। অন্তত গোরী তো পারে না। সে 'দেশ' বাঁধাবে বলে, সংখ্যার পর সংখ্যা সাজিয়ে রাখে। যখন ঘর উপচে পড়ে এই 'দেশ', তখন কপাল কঁচকে, 'এইসব বাঁধাতে তোমার কীসের যে আপত্তি, বুঝি না! আমার কোনো শখই তুমি মেটালে না' বলতে বলতে ২০/২৬টা 'দেশ' এক সঙ্গে কাগজে, বলার দরকার নেই যে আনন্দবাজারেই প্যাক করে, গোরী রেখে দিত সেই আলগা-বাক্সে। আর সেখানেই একদিন, গোরী ও দুলাল যৌদিন বাড়ি নেই, কী একটা দুলালীয় সামগ্রী কিনতে ভাই-বোনে বাজারে, তখন অকারণই, একটা বই খুঁজতে যা নেস্‌ফিল্ডের গ্রামার বই, যে বই-এর প্রয়োজন বহুকাল আগে একবার হয়েছিল, খুঁজে পাননি তখন, এখন প্রয়োজন নেই তবু সেই স্মৃতির কারণে, দেখা যাক বইটা বাড়িতে কিনা, এভাবেই খুঁজতে গিয়ে সে পেয়েছিল ওই ধরনের আরেকটি

প্যাকেট ; দেখে ভূত দেখার মতো চমকে গিয়েছিল। সে সেদিন সেই প্যাকেট খুলে, কী আছে ভেতরে, এই কৌতূহলে, খুবই ক্ষিপ্ৰ হ'তে পেরেছিল, দেখেছিল, পিকিঙ রিভিউ-এর তিনটি সংখ্যা, সঙ্গে মাও-এর

“Interview with Three correspondents— From The Central News Agency, The Sao Tang Pao and the Hsiu Min Pao”, “Present-day Colonial, Semi-Colonial and Semi-Feudal Society”, “Statement of the Spokesman of the Revolutionary Military Commission of the Central Committee of the Chinese Communist Party to the correspondent of the Hsinhua News Agency”, “Everything, through the United front is wrong”, প্রমুখ চারটি প্যাম্পলেট। তার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না ; এইসব উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলিল, আহা এভাবে পড়ে ! আজও প্যাক খোলা হয়নি, অথচ দুলালের নামে তারই প্রসঙ্গে আসছে সন্দূহ পিকিঙ থেকে নেপাল হয়ে, কিন্তু কেন ? তার মনে পড়ে গেল, ১৯৫১'র কলকাতার ট্রাম-মুভমেন্টের কথা, যা ছিল এক পয়সার লড়াই, ট্রামের একপয়সা ভাড়া বাড়ানোর বিরুদ্ধে যখন কলকাতার মানুষ ফেটে পড়েছিল প্যারি কমিউনের মতো উৎসাহে ও হিংস্রতায়। আঃ— সে সব দিন ভুলবার না। তবে তখন ফাস্ট ইয়ারে পড়ে। বি. পি. এস্. এফের সে নতুন সক্রিয় সদস্য। রাত-বেলাতে গেরিলা কায়দার তখন হয় ট্রাম-লাইন তোলা, নয় রাস্তায় অবরোধ। ভাবাই যায় না তখন শান্তনুও রাস্তায় নেমেছিল। এও ভাবা যায় না যে, তারই প্রফেসরকে সে স্বচক্ষে দেখেছিল গভীর রাতে ট্রামের লাইন ওপড়াতে। কিন্তু প্রসঙ্গ তা নয়— সেই সময় অল্প কমিউনিস্ট পার্টির এক ফ্যাকশন, ফিফটিওয়ান ফ্যাকশন নামে যাদের প্রসিদ্ধি, তাদের কিছু দলিল তার নামে আসত কিন্তু নিয়ে যেত সেই প্রসিদ্ধি হোলটাইমার, এখন সি পি. আই করে। এই ব্যবস্থা সে মানতে বাধ্য হয়েছিল, কেননা সেই হোলটাইমারের কাছে সে ছিল কৃতজ্ঞ। তার বাবা মারা যাবার পর সে তাদের জন্য অনেক কিছু করেছিল। মা এই একমাত্র কমিউনিস্টকে সহ্য করতে পারতেন। কমিউনিস্টরা ছিল মার দুচোখের বিষ। পার্টির এই হোলটাইমার যদিও ছিল কসবার এল.সি-র সেক্রেটারি কিন্তু তার এই গোপন উপদলীয় কারুকার্য সে একদম বন্ধুত্ব না। সে জানত মাত্র, এই গোপন দলিল তাদের বাড়ির ঠিকানায় আসবে এবং এলেই সময়-সুযোগ মতো সেই হোলটাইমারের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, কেউ যেন টের না পায়। এরকম গোপন কাজ করতে সে-বয়সে, খুবই খিল লাগত তার। এরকম খিল পেতে তাদের এই দুলাল তারই মতো মাত্র বোয়ারারের কাজ করছে না তো ? এবং এই কাজে দুলালের দিদিও পার্টনার। এমন পার্টনার যে শান্তনুর কাছেও অপ্রকাশ্য, যদিও তার সেই পার্টনার, বলার নেই যে, তারই স্ত্রী, গোরী। কিন্তু তখনই যে সে বিপদে পড়বে ভেবেছিল, তা নয়। তবে এ. বি. টি. এ.

কাম সি. পি. এমের কাছাকাছি থেকে এই আন্তবাম ঝাঁক অর্থাৎ এই নকশালী দলিলাদি যে মোটেই বরাভয়ের ব্যাপার না বরং উৎকণ্ঠারই ব্যাপার যদিও এসব তথাকথিত মার্কসীয় সাহিত্যই, কিন্তু হলে হবে কী, ততদিনে যে কমিউনিস্ট দুনিয়া বিধাবিভক্ত, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার ইস্পাতকঠিন ঐক্যে তখন ফাটল ধরেছে। সুতরাং তখনও বিপদে না পড়লেও শান্তনুর উৎকণ্ঠা বেড়েছিল। তারই বাড়িতে তাকে ঘৃণাক্ষরে কিছু না জানিয়ে এমন গোপন ব্যাপার-স্বাপারে সে অভিমানী না হয়ে পারল না। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলল না কাউকেও। চুপচাপ দেখে যেতে থাকল। ইতিমধ্যে দুলালের সেই বন্ধু আবার একদিন এল। তার কেমন সন্দেহ হ'ল। সে ঠিক করল, এই বন্ধুকে কিছু ওয়াচ করতে হবে। এদিন শান্তনু প্র্যান করে রাত গভীরে, গোরী যথারীতি ঘুমিয়ে পড়লে, ঘর ছেড়ে, বাইরে তাদের সেই এক চিলতে প্যাসেজের বাথরুম যাবার পথে, ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছিল, নিজেরই শোবার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে। হ্যাঁ, আড়ি পেতে সব শোনার জন্যই সে, শান্তনু, স্বয়ং তাদেরই শোবার ঘরের বন্ধ দরজার পাল্লায় কান রাখছে— এককথায় খুব অশুভ যদিও, তবু সে করোঁছিল এবং শুনোঁছিল যা, তা বড় ভয়ানক। তার আর বন্ধুতে বাকি রইল না যে এই বন্ধুটি প্রায় সেই হোলটাইমার, যে কিনা ওই প্যাকেটগুলি নিতে আসে। শুনোঁছিল, অনেক কথার মধ্যে এই কথগুলো যা প্রকৃতই ভয়ানক, “তাহলে ওই কথাই রইল, প্যাকেট যখন একবার খোলা অবস্থায় পাওয়া গেল, তখন সন্দেহ করতে হবে তোর রিভিসনিষ্ট জামাইবাবুকেই। তাছাড়া এ. বি. টি. এ. করা সি. পি. এম. মার্ক টিচারগুলো দু-মুখো সাপ, আমাদের প্রকৃত শ্রেণীশত্রু। দরকার হ'লে খতম করতে হবে। মনে রাখতে হবে ওই প্যাকেটেই ছিল সেই ইম্পরট্যান্ট ডকুমেন্ট, চেয়ারম্যানের ‘এভারিথিং থ্রু দি ইউনাইটেড ফ্রন্ট ইজ রং’, যে দিলে চেয়ারম্যান আমাদের শিখিয়েছেন, ইন্-শর্ট, নাইদার শব্দ উই ব্রেক আপ দি ইউনাইটেড ফ্রন্ট নর শব্দ উই বাইন্ড আওয়ার-শেলভস্ হ্যান্ড অ্যান্ড ফুট; হেন্স দি প্লোগান অব এভারিথিং থ্রু দি ইউনাইটেড ফ্রন্ট শব্দ নট বি পুট ফরওয়ার্ড। ইফ ‘সার্বিমিশন টু দা ইউনাইটেড ফ্রন্ট ইন এভারিথিং’ ইজ ইনটারপ্রেটেড অ্যাজ ‘সার্বিমিশন ইন এভারিথিং’, দেন দ্যাট টু ইজ রং। এই ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট, যা বাংলা কংগ্রেস, তথা কংগ্রেসকে নিয়েই, যারা আসলে কুয়োমিনটাণ্ড। যার নেতা অজয় মুকুঞ্জ হল চিয়াংকাইশেকের কার্বন কপি, সেখানে সি. পি. এম. নিজেদের সার্বিমিট করছে ও সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের পেটাচ্ছে তাদের বা ওই ইউনাইটেড ফ্রন্টকে কখনো ক্ষমা নয়। মনে থাকবে তো? এই জামাইবাবুর যতই তুমি খাও আর পর, আমাদের সঙ্গে যখন হাত মেলাতে চাও তখন ওই সব রিলেশন মাথা থেকে ঝেড়ে বাদ দাও, দরকার হলে এই জামাইবাবুকেই খতম করতে হবে, যদি সে বাড়াবাড়ি করে, কিংবা খোচোর হয়; কী, মনে থাকবে? মনে আছে তো, সি. এম.-এর সেই প্লোগান : প্রতিরক্ষাশীলদের পিঠের চামড়া তুলে নেওয়া হবে।...” উত্তেজিত কথা শেষ হলে ভিন্ন ক্ষীণ কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল, ও. কে।

না, আর না, এসব শোনার পর করণীয় একটাই থাকে, অন্য কিছু না, গৌরীকে ডেকে শোনানো। সেদিনই পারেন শান্তনু, কেননা সেদিন তারা আরো অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছিল শুন্যে শুন্যে। শান্তনু না শুন্যে পারেন। প্রায় থিলার পড়ার সাসপেন্স সে আসানসোলের মধ্যরাত্রির অসম্ভব মশা সহ্য করে সব শুন্যে গিয়েছিল। শুন্যতে শুন্যতে রাত ভোর করেছিল। সে সব কথার কিছুই ভোলেনি সে। শুন্যেছিল... “তাহলে সি. পি. এম. আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ছেলে বিয়ে করে পর হয়ে গেলে মা-বাবার কাছে সে-ছেলে যেমন শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, না ঠিক তেমন নয়; পুত্রবধূর সঙ্গে শাশুড়ির যে সম্পর্ক, প্রায় সেই সম্পর্ক। ওরা আমাদের পেটাবার জন্য এদেশের জনস্বার্থবিরোধী সংবিধানের সাহায্য নেয়। পদলিঙ্গ-সি. আর পি.-মিলিটারি ডাকে। বামফ্রন্টের ধূয়া তুলে দক্ষিণপন্থী ঝোঁকওয়ালা পার্টিগুলির সঙ্গে বসে আমাদের খতম করার পরিকল্পনা করে। সি. পি. এমের কে বেশি আত্মীয় হ’তে পারত, আমরা না বাংলা কংগ্রেস? আমরা না সংবিধান?... ”

...“তুমি যদি রাজনীতি শিখতে চাও তাহলে ঘটনা-সম্প্রদায় বৈঠকে যোগ দাও। ঘটনা-সম্প্রদায় বৈঠক কী? ঘটনা-সম্প্রদায় বৈঠক হল, একটি লোকালয়ের এগিয়ে-থাকা, মধ্যবর্তী ও পশ্চাৎপদ মানুষের সঙ্গে সেই লোকালয়ের উৎপাদন ব্যবস্থা, সমাজ সংস্কৃতির সম্পর্ক খোঁজা এবং সেই সূত্রে সেই লোকালয়ের চরিত্র বোঝা। এভাবে অনেকগুলি লোকালয়ের চরিত্র বুঝলে আমরা এদেশের রাষ্ট্র চরিত্র বুঝতে পারব। রাষ্ট্র চরিত্র না বুঝলে জনগণের দৃষ্টান্তের মূল কারণ ও দৃষ্টান্ত দূর করার সঠিক রাস্তা পাওয়া যায় না। আমরা একটি ঘটনা-সম্প্রদায় বৈঠক করে বর্ধমানের একটি গ্রামের সম্পর্কে জানতে পারলাম যে এই গ্রামের শতকরা ৪০ ভাগ জমি রয়েছে ভূস্বামীদের মালিকানায়, শতকরা ৩০ ভাগ জমি ধনীকৃষকদের মালিকানায় এবং ১০ ভাগ ভূস্বামী ও ধনীকৃষকদের মালিকানায় বংশানুক্রমিক দেবোত্তর সম্পত্তি। সবটা মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে জমির ৮০ ভাগ রয়েছে ভূস্বামী ও ধনী কৃষকদের মালিকানায় আর মাত্র শতকরা ২০ ভাগ রয়েছে মধ্য ও গরিব কৃষকদের মালিকানায়। অথচ ভূস্বামীর সংখ্যা ছিল সমগ্র জনসংখ্যার ১ ভাগের বেশি নয় এবং ধনী-কৃষকদের সংখ্যা শতকরা ৫ ভাগের বেশি নয়— যেখানে দরিদ্র ও মধ্য কৃষক মিলিয়ে ছিল জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ। একদিকে জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৬ ভাগ লোক মালিকানা ভোগ করছিল শতকরা ৮০ ভাগ জমির উপর, অপরদিকে জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ লোক মালিকানা ভোগ করছিল মাত্র ২০ ভাগ জমির উপর। এ অবস্থা চলতে পারে না। এ অবস্থা বদলানো দরকার। দরকার, জনসংখ্যার পনেরো আনা লোক জমির পনেরো আনা মালিকানা পাবে। কিন্তু দেশের সংবিধান ও আইন বৈধভাবে এই অবস্থা আনতে দেবে না। অর্থাৎ বৈধ পথে আমাদের দেশের ৮০ জনের জন্য দেশের ৮০ ভাগ জমির বিলি-ব্যবস্থা করা যাবে না। কেননা সংবিধান বলছে, ক্লজ নাইনিটিনে : অল সিটিজেন শ্যাল হ্যাভ দা রাইট টু অ্যাকোয়ার, হোল্ড, অ্যান্ড ডিসপোজ অব

প্রপার্টি'। লক্ষ কর, রাইট টু অ্যাকোয়ার, নট দা রাইট টু সিজ দা প্রপার্টি'। তবু যদি অ্যাকোয়ারের ভুল ব্যাখ্যা করে, এজন্য সংবিধান থার্টিওরান্ন ক্লজে বলছে, নো পার্সন শ্যাল বি ডিপাইভড অব হিজ প্রপার্টি সেভ বাই অর্থারিটি অব ল। এখন বোঝ! বৈধ পথে কী সম্ভব? ওই এইট'টি পারসেন্ট পিপলের জন্য ল্যান্ড সিজ করা বা অন্তত ওই অ্যাকোয়ার করাও কি সম্ভব বৈধ পথে? বল! কেমন করে সংবিধান পিপলের ভাত মারছে, বোঝ, এমনিতে নো পার্সন শ্যাল বি ডিপাইভড অব হিজ প্রপার্টি—মন দিয়ে শোন্ প্রপার্টি সেভ বাই ল! অথচ ওই এইট'টি পারসেন্ট ল্যান্ড মাত্র—সিক্স পারসেন্ট পিপলের দখলে, হোল্ড করা। কাজে কাজেই অবৈধ পথে সংবিধানের বাইরে গিয়ে, তোর জামাইবাবু মার্কা সি. পি. এম.-দের পার্লামেন্টারি পথের বাইরে গিয়ে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পথ ধরেই শতকরা ৮০ ভাগ লোকের জন্য জমি দখল করতে হবে এবং এই দখল হবে আসলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল কেননা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার মধ্য দিয়েই মাত্র সংবিধানকে দখল করে তাকে জনস্বার্থে পাণ্টে নেয়া যায়। এছাড়া আর কোনো পথ সামনে খোলা নেই।... সর্বদাই মনে রাখতে হবে আমাদের পথে ফুল ছড়ানো নেই, বিশেষত তোর জামাইবাবুর দল তো কাঁটা ছড়াতেই আছে। ওরা হল ধনতন্ত্রের লেজুড, সংশোধনবাদী কুস্তা।'... এইসব শব্দতে শব্দতে শান্তনু রাত ভোর করেছিল। তাদের বাড়ির চড়ুই পাখিগুলি মৃদু অথচ মোনোলিথিক ঐক্যে ডাকতে শব্দ করছিল। কাছে পিঠে কোথাও কাক ডেকেছিল। জি. টি. রোডে মাঝে-মধ্যে শব্দ ট্রাকের শব্দ আসছিল কিন্তু ওই দিন শেষ রাতে সে জীবনে প্রথম কোনো এক্সপ্রেস বাসের শব্দ যেন শুনছিল। ট্রেনের দারুণ শব্দে ভরে গিয়েছিল শেষ রাত। হয়ত বা কালকা মেলের শব্দ ছিল সেদিন। শান্তনু ফিরে গিয়েছিল স্বশয্যায়। না, গোরী কিছু বোঝেনি। অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। সর্বদা শাড়ি টেনেটুনে আপাদমস্তক রাখা-ঢাকা গোরী হাঁটু অর্ধ শাড়ি তুলে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল সেদিন। তার খোলা দুই পা ওই রাতভোরেও স্পষ্ট আরেক কথা বলছিল। শান্তনু শোনেনি। তার মাথায় তখন আগুন জ্বলছিল। যেন এখনি কিছু করা দরকার এমন অস্থিরতায় সে চোখ পর্ষন্ত বৃজতে পারেনি সেদিন। আশ্চর্য, তারই বাড়িতে, তারই খেয়ে পরে, তাকেই খত্তম করার ষড়যন্ত্র, উঃ! ভাবতে পারছিল না শান্তনু, গোরীও এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার। হয়তো বা জানেনা সব, তবু তো অংশীদার! না, এর বিহিত করতেই হবে। এই ভেবে সেদিন শান্তনু চেষ্টা করে মাথা ঠান্ডা রাখছিল। সব কথা সূধীর, গোপীদা, বামাপদদা বা বিজয়দাকে বলা উচিত হবে কিনা ভেবে পাচ্ছিল না সেদিন। অবশ্য বিজয়দাকে বলা যায়, তাঁর সঙ্গেই শান্তনুর যা কিছু সম্পর্ক আর তিনিই তো এখানকার প্রবীণতম কমিউনিস্ট নেতা। কিন্তু যতদূর জানে শান্তনু, বিজয়দা খুবই অসুস্থ। আর বামাপদদা বড় ভালো লোক তাকে এসব বললে, তিনি হেসে বলবেন, 'রাজনৈতিক গুরে এর মোকাবিলা করা দরকার।' কিন্তু তা যে কী রাজনীতিও কেমনভাবে, তা বলবেন না ;

কেননা তাঁর বিশ্বাস, স্থানীয় কমরেডদের সাহায্যে অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।... এবং ততদিনে শান্তনু বেঁচে থাকবে কিনা ঠিক নেই। তবু কারুর কাছে তো যেতেই হবে। একা একা সে ওই গণফৌজের সঙ্গে তো আর লড়াইতে পারে না! এরকমই ভেবেছিল শান্তনু কিন্তু ঘটনা সেরকম হয়নি।

সেদিনই স্কুলে গিয়ে শুনোঁছিল, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির গোপালচন্দ্র সেনকে নকশালরা খতম করেছে এবং এভাবেই নাকি তারা শিক্ষক-সপ্তাহ পালনের মধ্য দিয়ে তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষকদের খতম করবে। স্কুলে এ নিয়ে খুব টেনশন দেখা দিয়েছিল সেদিন। এ.বি.টি.এ.-র টিচাররা শোকসভা করার প্রস্তাব দিয়েছিল। হেডমাস্টার রাজি হননি। শান্তনু সেদিন বড় চুপচাপ ছিল। সব্দাই তার পিঠ শিরশির করছিল। সে কিছুর আগেভাগেই বাড়ি ফিরেছিল এবং গোরীকে একা পেয়ে সবিস্তারে গোপালচন্দ্র সেনের নিহত হবার খবর দিয়েছিল। কিছুর কাজ হয়নি। গোরী বলেছিল, গোপালচন্দ্র সেন নাকি আমেরিকার দালাল, সিয়ার এজেন্ট। ভাবাই যায় না, গোরী এরকম মন্তব্য করবে।... সিয়ার এজেন্ট ধরা অতো সোজা না। তাছাড়া জনগণকে আরো জি.সি. সেন সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানানো হবে। তখন যদি জনতার রোষ ফেটে পড়ে, সে কথা আলাদা। খতম করে তারপর জানানো হ'ল লোকটা খারাপ, সিয়ার এজেন্ট; কিংবা পিঠের চামড়া তুলে তারপর জানানো হ'ল লোকটা প্রতিক্রিয়াশীল, এ হ'তে পারে না।...কিন্তু এসব কথা গোরীকে জানানো বৃথা। সে ধরে বসেই ছিল, যদি সত্যি সত্যি নকশালরা খুন করে তাহলে বুঝতে হবে ওই নেপাল হয়ে আসা চীনের ডকুমেন্টারি প্যাকেট খোলা স্বেচ্ছাকৃত বিপ্লববিরোধী জনস্বাধিবিরোধী কাজ অর্থাৎ আমি আমার বাড়ির মধ্যকার আরেকটি সম্পর্ক না জেনে যদি সেই সম্পর্কের কোনো গোপন ব্যাপার টের পাই তাহলে আমি খারাপ। বাঃ।

না, এসব কথা সেদিন বলেনি সে। গোরী টের পেয়ে যেত, ওরাও টের পেয়ে যেত, তাহলে কি আর তিষ্ঠতে পারত সে? তবু এত করেও বা কিছুরই না করেও একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল। একদিন দুপুরে শান্তনু যথারীতি স্কুলে গিয়েছিল। ক্লাস হয়নি। কেননা তাদের স্কুলের মূল্যবান ল্যাবরেটোরির দরজা ভেঙে কারা যেন তছনছ করে গেছে সব। দেয়ালে লিখে গেছে, “সত্তর দশক মনুষ্যের দশক”... “স্কুল কলেজ বন্ধ রাখো, কৃষি বিপ্লবের পথ ধরো”... ইত্যাদি। শান্তনুর বুঝতে বাকি থাকেনি সেদিন কারা এইসব করল। তারা তাহলে সক্রিয় অর্থাৎ শান্তনুকে সাবধান হ'তে হবে। সে বাড়ি ফিরে এসেছিল সাত-তাড়াতাড়ি। ভেবেছিল, বাড়ি ফেরার পথে একবার বিষ্ণুপদর কাছে যাবে, সেই একমাত্র সি.পি.এম.-ঘেঁষা যুবক, যার কোনো ভয়ভর ছিল না। সে-সময় বিষ্ণুপদ তাকে খুব মান্য করত। শূদ্ধ মাস্টারমশাই বলে না, তাকে একবার রিভিসনিজম্ বুদ্ধিয়েছিল শান্তনু। একদা হাতে ‘এগেইন্স্ট রিভিসনিজম্’ নিয়ে সে বুঝতে এসেছিল সি.পি.আই. কেন

থারাপ। সে বোঝাতে পেরেছিল। সেই কৃতজ্ঞতার সে প্রায় ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করত। কিন্তু সেদিন শান্তনু তাকে বাড়িতে না পেয়ে নিজের বাড়িতেই ফিরে এসেছিল। সদরের কাছে এসে তার কেন যেন মনে হয়েছিল ভেতরে কিছু চলছে। ভাই-বোনে কথা। চাপা অথচ উত্তেজিত।

—কতবার বলব, কেউ খেয়ে গেলে আপত্তি হবে কেন? বিশেষ করে যখন বলছ, সে তিনদিন কিছু খায়নি। কিন্তু এভাবে টেবিলের নীচে দু-দুটো প্লেট রেখে দেওয়া, এ কি ভালো দেখায়? তাছাড়া জানোই তো জামাইবাবু মাছের হিসেব করেন। হয় তোমার, না হয় তার মাছ খাওয়া উচিত হয়নি। তাহলে হিসেব ঠিক থাকত। আমি বলব তোমারই মাছ খাওয়া ঠিক হয়নি। সে না হয় আমি মাছ না খেয়ে হিসেব ঠিক রাখব কিন্তু প্লেটটা ধুয়ে রাখা ভালো ছিল, যাতে কেউ টের না পায়, কেউ এসে খেয়ে গেল। দেখছ না, দিনকাল!

—ও অবশ্য প্লেটটা রিন করতে চেয়েছিল, আমি দিইনি, আমি তো ভাবিনি, তুমি এত দেরি করবে? গিয়েছিল কোথায়?

—বলছি তো, সেটা বড় কথা না, যাব আবার কোথায়? বললামই তো নমিতাদের ফ্ল্যাটে। বড় কথা হ'ল, ধরো, এখুনি যদি তোমার জামাইবাবু এসে পড়েন। টেবিলের তলায় দুটো প্লেট দেখে ভাববেন, আমাদের দুজনের খাওয়া হয়ে গেছে। তার মানে আমাকে অনাহারে থাকতে হবে যতক্ষণ তোমার জামাইবাবু বাড়িতে থাকবেন। এটা আর কোরো না। কে এসেছিল?

—এসেছিল।

—আমাকে নাম বলতে কী হয়েছে! আমি কী তোমার জামাইবাবু?

—আসল নাম আমি জানিনা। সবাই বড়খোকা বলে।

—এত গোপনতা অথচ প্লেট না ধুয়ে রেখে দিলে!

—আমি ধুয়ে দিছি।

—তুমি এখনও বুঝলে না। যাক আমি যখন এসেই পড়েছি, আমিই ধুয়ে দিছি। তুমি নিজে ভালো করে খেয়েছো তো?

—হ্যাঁ।

শান্তনু আর দাঁড়াল না। সেদিন পাকেচক্রে নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় এসে তাকে ফিরে যেতে হয়েছিল রাস্তায়।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ঘটেছিল সন্ধ্যায়। সেই বিষ্ণুপদ ৪/৫ জন যুবকসহ এসেছিল। প্রায় হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো আনন্দে শান্তনু তাদের দেখে উৎফুল্ল হয়েছিল; কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারেনি, কেননা বিষ্ণুপদদের মুখ অসম্ভব গম্ভীর ছিল। বিষ্ণুপদ যেমন দেখা হলেই একগাল হেসে মাস্টারমশাই বলে, সেরকম না। একেবারে অন্যরকম হয়ে সকলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছিল বাড়িতে। ঢুকেই বিষ্ণুপদ সদর বন্ধ করে দিয়েছিল। বন্ধ

করে মনোহৃত^১ দৌর করেনি। ভিন্ন গলায়, আমরা কিছুর কথা বলব, কোথায় বসব আমরা, আপনার সেই পলিটেকনিকের শালা কৈ ?

—কী ব্যাপার ?

—বলছি, বলুন কোন ঘরে বসব ?

—আমার আর ঘর কৈ ? চলো শোয়ার ঘরেই বসি।

শোয়ার ঘরেই বসেছিল সকলে। যেখানে সেই দুলাল তার খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে ছিল আগের থেকেই। তার দিকে প্রথমে না তাকিয়ে শান্তনুকেই লক্ষ করে বিষুপদ বলেছিল, আপনি কি জানেন, আপনার বাড়িতে অনেক কিছুর চলছে, এই বাড়ি নকশালদের ডেন হয়েছে, আমরা এপাড়ায় এসব হতে দেব না। শান্তনু বলতে যাচ্ছিল, আরে এজন্যই তো আজ দুপুরে তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ না ডাকতেও ঠিক সে-সময় গৌরী ঘরে ঢোকায় সে সামলে নিয়েছিল, পারেনি কিছুর বলতে।

গৌরীকে দেখে প্রায় আদেশের সুরে বিষুপদ বলেছিল, আপনি যান বৌদি, আপনি এখানে কেন ? আমাদের নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে।

—কেন আমি থাকলে কী হয় ! আমি থাকব।

—না আপনি থাকবেন না।

বলতে বলতে বিষুপদ উঠে এমনভাবে গৌরীর দিকে এগিয়েছিল যে শান্তনু বলতে যাচ্ছিল, কেন ও থাকনা, কিন্তু বলা হয়নি সে কথা কেননা বিষুপদ কিছুর মারমুখী ছিল বদুখে সে বরং বলল, থাক গৌরী, তুমি যাও, তুমি এখানে থেকে না ! ভয় পাচ্ছ কেন ? বিষুপদ তো আছে। গৌরী চলে যেতেই বিষুপদ শোবার ঘরেরও দরজা বন্ধ করল। তারপর ঘুরে দুলালকে লক্ষ করে বলেছিল, এই যে চাঁদ, আর ঘাপটি মেরে পড়ে থেকে না, এবার ওঠো, চটপট কয়েকটা কথার জবাব দাও তো।

কথা শেষ হবার আগেই বিষুপদের একজন সঙ্গী এক হ্যাঁচকা টানে দুলালকে শোওয়া থেকে বসতে বাধ্য করেছিল।

—আজ দুপুরে কোন চাঁদ এসেছিল তোমার কাছে ? উল্টোপালটা উত্তর দিয়েছ কি মন্থের জিওগ্রাফি পাল্টে দেব।

—আমার বন্ধু।

—সে তো জানি, কিন্তু কে ?

—আমি তার নাম জানি না।

—ঠিক আছে তোমাদের অ্যাকশন নামই বলা তো এবার।

—জানি না।

—মাস্টারমশাই, তাহলে শুনুন, আপনার জানা উচিত, অবশ্য আপনিও ওদের লেজুড় হয়েছেন কিনা জানিনা, তবে শুনুন, আজ দুপুরে আপনার বাড়িতে যে এসেছিল, সে আমাদের একজন সিনিসায়ার কমরেডকে খতম করেছে—আমরা আপনার শালাকে ছাড়ব

না যতক্ষণ না তাকে পাই, আমরা ওকে আটকে রাখব। আপনি বন্ধা দিলে শুনব না। অবশ্য এ খবরও আমাদের আছে, আপনি দুপুর্বে একবার বাড়ি এসেছিলেন, তখন অবশ্য পাখি পালিয়েছে, কিন্তু আপনি এসে বাড়ি ঢোকেনি। ফিরে আবার কোথাও চলে গিয়েছিলেন।

—তোমরা যা বলছ, বিষ্ণু, এতো আমার ধারণার বাইরে। দেখছি, সবাই সবকিছু জানে, আর আমিই কিছু জানি না। ব্যাপারটা খুলে বলো তো?

—আপনাকে সব কথা খুলে বলা যাবে না, আমাদের উপর নির্দেশ আছে, আপনাকে না ঘাঁটিয়ে ওই দালালকে বেমালদুম তুলে নিয়ে যাওয়া।

—দাঁড়াও, আমারও দায়িত্ব আছে, আমাকে সব বুঝতে দাও।

—আপনাকে সব বোঝানো বৃথা, কেননা আপনি কোনো দায়িত্ব পালন করেননি, আপনার বাড়িতে এসব হতে দিয়েছেন। প্রায়ই নানা ধরনের ছেলে আসে আপনাদের বাড়িতে—রাগেও আসে, থাকে—আপনি যদি এখন ন্যাকা সাজেন আমাদের কিছু করার নেই, আমরা ওকে ছাড়ব না।

বিষ্ণুপদ প্রথম থেকেই তার সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলছিল না কিন্তু তা যে এই পর্যায়ে যাবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। আহা, সে যদি আগে বিষ্ণুপদের সঙ্গে দেখা করত, তাহলে ঘটনা এরকম হ'ত না। তবু সে শেষ চেষ্টা করল, বলল, তোমার কাছ থেকে এমন ব্যবহার আমি আশা করিনি, বিষ্ণু!

—আমরাও আশা করিনি, আপনার উপস্থিতিতে এই বাড়ি নকশালদের ডেন হয়ে যাবে।

—আমাকে কিছু সময় দাও, আমাকে সব বুঝতে দাও, আমি কথা দিচ্ছি, কে এসেছিল আজ আমার বাড়ি দুপুর্বে, এ আমি খুঁজে বার করব।

—সে আপনার কন্ম নয়। আমরাই এত ওয়াচ রেখে ফেল করলাম, আর আপনি পারবেন! বরং আমাদের হাতে আপনার শালাকে ছেড়ে দিন আমরা বুঝে নেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার উপর কোনো হামলা করব না। কিন্তু যদি বাধা দেন তাহলে আপনাকেও আমরা ছাড়ব না। ঠিক সেই সময় গৌরী অসম্ভব নার্ভাস হয়ে বাইরে থেকে দরজা ধাক্কা দিয়েছিল। তার কথাগুলোও স্পষ্ট শোনা গিয়েছিল, 'দরজা খোলো, এ বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে।'

টোনে যাই থাক অন্তত বিষ্ণুপদ এগিয়ে গিয়েছিল দরজা খুলতে। খুলেও ছিল। গৌরী ঘরে ঢুকে আবার বলেছিল, 'এ বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে।'

—বলুন।

—তোমরা যদি মনে করে থাক, ওকে আটকে তোমরা তাকে পাবে, তাহলে ভুল করবে। আমার ভাই সম্পর্কে আমার যা ধারণা তা তোমাদের এখন বলে কিছু লাভ নেই। পরে এ বিষয়ে বলা যাবে, তোমরাও সব বুঝবে।

—আপনি এখন বলুন, আমরা এখন বলব।

—এখন বললে কি তোমরা বিশ্বাস করবে?... ও আমার মাসতুতো ভাই। আমার এই মেসোমশাই বস্বেতে থাকেন। বস্বের এক টেক্সটাইল ফার্মের তিনি পার্সোনেল ম্যানেজার। ও তাঁর একমাত্র ছেলে। বড় আদুরে। যে জন্য ও গোল্লায় গেছে। ও এর আগে কানপুর আই. আই. টিতে পড়ত। বন্ধু-বান্ধবের পাঞ্জায় পড়ে পড়াশুনো শিকের তুলেছিল। তার আগে ও পিলানীতে পড়ত। সেখানে তো এঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে ম্যাথস, ম্যাথস ছেড়ে ফিজিক্স পড়াছিল। তারপর ওরা আর ওকে রাখেনি। সাতঘাটের জল খেয়ে এখানে এসেছে। আর ওর যা স্বভাব, আবার সেই বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা। নকশালরা ওকে ঘৃণা করে। ধাক্কা থেকে নকশালরাই ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বাধ্য হয়ে আমরা ওকে রেখেছি, আমরা তো ওকে ফেলে দিতে পারি না। হ্যাঁ, সত্যি, ওর বন্ধু-বান্ধব যখন-তখন আসে, আমাদের এই ছোট সংসারে খুবই অসুবিধে হয়। আজ যে বন্ধু এসেছিল, তাকে দেখিনি। ও নিজেও আমাকে বলেছে, ও এই বন্ধুর নাম পর্যন্ত জানে না। থাকতে এসেছিল। আমরা কেউ তখন বাড়ি ছিলাম না। ও বলেছিল, সকলে আসুক, তারপর থাকার কথা ভাবা যাবে। কিন্তু সে-বন্ধু বেশিক্ষণ থাকেনি। আমি পাশের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম, আমিও পর্যন্ত তাকে দেখিনি। আমার মনে হয় না ও নকশালদের সঙ্গে জড়িত। তাহলে তোমাদের মাস্টারমশাই না জানতে পারুন, আমি অন্তত জানতাম।...তা ছাড়া একটা কথা ভেবে দেখ, আমি যতদূর আনন্দবাজার পড়ে জেনেছি, এই নকশালরা বড় ভয়ংকর। ওদের পাপপুণ্য বোধ নেই। ওরা বড় রেকলেস। ওরা কি এ পাড়ায় নেই ভাবো? এখন ওরা সর্বত্র আছে। ওকে ধরে নিয়ে গেলে ওরা জানতে পারবে। আর নিশ্চয় আরো বেশি গা ঢাকা দেবে। এখন যদি তোমরা ওকে মেরে ফেলতে চাও তাহলে কি ওরা ওর প্রাণ বাঁচাতে তোমাদের হাতে নিজেদের ধরা দেবে ভাবো? কক্ষণো না। বরং আমার ভাই-এর প্রাণ ওদের কাছে কোন ফ্যাক্টরই না। তার চেয়ে শোনো, আজ খুব গোপনে ওকে বস্বে পাঠিয়ে দাও।...তোমরা ওয়াচ রাখো, আমিও ওয়াচ রাখব। ওদেরকে জানতে দেব না, আমার ভাই এখানে নেই। সুতরাং ওরা আসবে। যদি অবশ্য তোমাদের কথামতো ওরা নকশালই হয়। আমি জানি না। তোমরা অবশ্য আমার চেয়ে ভালো জানো।...

ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই সন্ধ্যায়। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারেনি। শান্তনু মনে মনে গৌরীর বন্ধুর তারিফ না করে পারেনি। সে তার কথার অনেক কিছুই কনট্রাডিক্ট করতে পারত, করেনি সেদিন।

অবশেষে বিষ্ণুপদদের সম্পূর্ণ গ্রিপে এনে গৌরী ছেড়েছিল সেই মোক্ষম অস্ত্র যা ভুলবার নয়। বলেছিল, 'আমি টাকা দিচ্ছি। তোমাদের মধ্যে কেউ ওর সঙ্গে যাও, অন্তত তেমন কেউ, যাকে তোমাদের পার্টির লোক বলে লোকে কম জানে, বা জানেই না।'

ধরা দিয়েছিল বিষ্ণুপদরা। মৃদুত্ব' দে'র হয়নি গৌরীর গ্রি'পে যেতে। শূ'দ্র ও'রা পরস্পরের মৃ'খ চাও'রা-চাও'য় করেছিল ৫/১০ সেকেন্ড। তারপর বিষ্ণুপদ মৃ'খ খুলেছিল।

'প্রস্তাবটা ভালো। কিন্তু কথা, আপনার ভাইয়ের যে কোনো বন্ধু এলে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। আমরা ফাইন্যান্সি কিছুক্ষণের মধ্যে যা বলার বলে যাচ্ছি। কে সঙ্গে যাবে, তাও বলে যাচ্ছি।... মাস্টারমশাই আপনাকে যদি কিছু খারাপ কথা বলে থাকি ক্ষমা করবেন। আমরা কিন্তু এখন থেকেই এ বাড়ি ও'রাচ রাখব।' আসলে বলতে গেলে মাপ চেয়ে প্রকারান্তরেই ভয়ই দেখানো।

চলে যেতে যেতে শান্তনু স্পর্শ শূ'ন্যেছিল, কে যেন ফিসফিস করে বলেছিল, 'আমি যাব সঙ্গে, আমি জন্মে বন্ধে দেখিনি।'

শূ'ন্যে শূ'ন্যে শান্তনু ভাবছিল, অত টাকা গৌরী দেবে কোথেকে। কিন্তু এ ব্যাপারে শান্তনু ভালোই জানে, গৌরী তার মাথায় কঠাল ভাঙবে না, নিশ্চয় দু'লালের টাকা আছে। টাকা তার থাকে, ভালো মতনই থাকে। তাই দিয়েই সব হবে।

যাই হোক, রাত ঠিক সাড়ে সাতটার বিষ্ণুপদ সঙ্গে একজন পরিচ্ছন্ন বাবু-যুবক এনে বলেছিল, ওই প্রস্তাব তারা মানছে এবং সঙ্গীকে দেখিয়ে আরও বলেছিল, 'এই ছেলোট সঙ্গে যাবে। এর যাওয়া-আসা ও বন্ধেতে থাকার খরচ দিতে হবে।'

সেদিন দু'লালের কথা ভেবে গৌরী যখন বলেছিল, 'বার্থ' রিজার্ভের কী হবে?' উত্তরে বিষ্ণুপদ রাজার মতো বলেছিল, 'ওসব ঠিক আছে, আমরা একটা ভি. আই. পি. সিট পেয়ে গেছি, ওতেই ম্যানেজ হয়ে যাবে।'

শান্তনু তখনকার মতো বিপদ কেটে গেল ভেবে খুব উল্লাস বোধ করেছিল। এমন কি অতি উৎসাহে, বলা যায়, প্রায় পকেট খালি করে, দু'লালের জন্য শেষ চিকেন কিনতে গিয়েছিল ওই রাতে, বলা ভালো, ওই সাড়ে সাতটার পর। তখন তার মনে টগবগ করছিল দু'টি ব্যাপার। এক, আপাতত বিপদ কেটে গেল আর দুই হল, এক টিলে দুই পাখি মারার মতো দু'লালকে বাড়ি ছাড়া করা গেল। মনে আছে ভালো, সেদিন মৃ'গি' কিনে বস্তিনবাজারে তার ছাল ছাড়াবার সময় যখন মৃ'গি'র সাদা মাংস জ্যোৎস্না দিচ্ছিল খুব, তখন সে না ভেবে পারেনি, অনেকদিন পর গৌরীর সঙ্গে আনন্দ করা যাবে। হাস, মানু'ষ কতরকম অবস্থার মধ্যেও এসব ভাবতে পারে!

কিন্তু হয়নি, কিছুই হয়নি। বিপদও কার্টোন, আর গৌরীর সঙ্গে আনন্দও করা হয়নি। কেননা ভাত-মাংস খেয়ে রাতি ১০টার পর সে যখন শোবার ঘরে মরার মতো পড়েছিল, তখন প্রায় ঘু'মিয়ে পড়ার অত্যা'জ্ঞবল সময়ে সে তাদের ভাঁড়ার ঘরে ফিস-ফিস শব্দ শূ'নে না উঠে পারেনি। উঠে স্পর্শ দেখেছিল, তাদের ভাঁড়ার ঘরে, গৌরী খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে, দু'লালকে জড়িয়ে ধরে, নিজের বুক'র কাছে এনে, শান্তনু উঠে ভাঁড়ার ঘরের কাছাকাছি যাবার পরও, বলেছিল, 'তুই আমাকে ভুল বুঝিস না রে!

এসবই তোর ও তোদের জন্য করা। ভয় নেই রে, তোকে বা তোদেরকে বিপদে ফেলব না, দেখিস। আমার ছেলে নেই, একথা ভুলিস না কখনও।’ শান্তনু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। পা টিপে টিপে শোবার ঘরে এসে পদ্মনরায় মরার মতো শূন্যে পড়েছিল।

তারপর যথারীতি কাঁটায় কাঁটায় রাত সাড়ে দশটায় সেই পরিচ্ছন্ন বাবু-বাবু যখন দুলালকে নিতে এসেছিল, তখন দুলালের অসহায় মূখ...আঃ, শান্তনু মরে যাবে, তবু কখনো ভুলবে না তার সেই চোখ! হ্যাঁ, শান্তনুও সোঁদীন গোরীর মতো কেঁদেছিল। সদর বন্ধ করতে করতে কিছু উচ্চস্বরেই কেঁদেছিল শান্তনু। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়া গোরীকে নিয়ে শোবার ঘরে এসে যখন আশ্রয় দেবার মতো আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছিল গোরীকে, তখনি, হায়, গোরীর নরম বুক ও তার হাঁটুর উপরকার উষ্ণ কোমল অঙ্গ তাকে কামনার দিকে না ঠেলে পারেনি। তার সেই ঘন ঘন মাথা নাড়ার দিনে সন্তরের সেই রুদ্র-সমুদ্রের বাহু প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল গোরীকে।

সে, গোরী, তার বাঁধন থেকে প্রায় ছিটকে গিয়ে বলেছিল,

—বিশ্বপদদের কে খবর দিল, তুমি? ...একবার নাকি দুপদুরে তুমি বাড়ি এসেছিলে?... ঢোকানি কেন?... কিছু কি দেখেছিলে? এত নীচ, এত ছোট তুমি!

এর কোনো জবাব দেওয়া যায় না। শূন্য গোরীকে ভাঁড়ার ঘরে শূন্যে দেবার অধিকার দিয়ে নিজে ভুল করে দুলালের খাটে শূন্যে, ভুল বৃষ্টিও সেখানেই প্রায় বিন্দু রাত কাটাতে হয়।

পরের দিন থেকেই শূন্য হয়েছিল বিপদ।

কর্তাদিন মনে পড়ে না, তবে মনে হয়, আসানসোল ছাড়ার আগের দিন পর্যন্ত শান্তনুর বড় দুঃসময় গিয়েছিল। গোরী পারতপক্ষে তার সঙ্গে কথা বলেনি। সেই যেমন থাকার অর্থাৎ রাতে ভাঁড়ার ঘরে আগের মতোই শূন্যে, তাকে ঠেলে দিয়েছিল শোবার ঘরে।

এর মধ্যে একবার জনাভস, একবার হাম, আর দু-বার কোলাইটিসে কষ্ট পেলেও এর কোনো হেরফের হয়নি। কেননা দুলাল, দুলালের বন্ধুরা, এমন কি গোরীও এই ১৯৭০-এও ফিরে গিয়েছিল, এ দেশেরই সেই উন্মত্ত স্বাধীনিকতার ১৯১৬-তে, যখন বিলিতি কাপড় পোড়বার ঝোঁকে তারাও এমন খত্তম অভিযান চালিয়েছিল। তাই তখনকার সন্দীপের মতো ওরাও এখন বলে,

“—সেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে, সেটুকুই আমার, এক কথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি, সেইটাই যথার্থ আমার, এই হল জগতের শিক্ষা। দেশে আপনা-আপনি জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয়; দেশকে যোঁদীন লুণ্ঠ করে নিয়ে জোর করে আমার করতে পারব, সেই দিনই দেশ আমার হবে।...লাভ করার

স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোনো কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব, প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই। মনের দিক থেকে যেটা চাচ্ছে বাইরের দিক থেকে সেটা পেতেই হবে, প্রকৃতিতে ভিতরে বাইরে এই রফাটাই সত্য। এই সত্যকে যে শিক্ষা মানতে দেয় না, তাকেই আমরা বলি নীতি বা বৈধ পথ, এজন্যেই নীতি বা বৈধ পথ বা সংবিধানকে আজ পর্যন্ত কিছুতেই মানুষ মেনে উঠতে পারছে না।...যারা কাড়তে জানে না, ধরতে পারে না, একটুতেই যাদের মূঠো আলগা হয়ে যায়, পৃথিবীতে সেই আধমরা একদল লোক আছে— নীতি, বৈধ পথ, সংবিধান, সেই বেচারাদের সান্ত্বনা দিক।”

কিন্তু এত কথার পরেও শান্তনু সান্ত্বনা পায়নি। তার ঘুম নষ্ট হয়েছে। চোয়াল বসে গেছে। সে কতদিন দাঁড়ি কামায়নি। দিনে একবার ছাড়া চুল আঁচড়ায়নি। তবু শান্তনু বিপদে পড়েছে। ঘরে বাইরে। গৌরী তার কাছে শোয়নি। বিষ্ণুপদর সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে মুখ ঘুরিয়ে চলেছে, কেননা দুলালের বন্ধুরা আর এ পাড়া বা তাদের বাড়ির পথ মাড়ায়নি।

কিন্তু এ বড় আশ্চর্য যে, দুলালের বন্ধুরা কোথেকে যে টের পেল সব! তাদের জানার কথাই না। যেভাবে বিষ্ণুপদর দল দুলালকে নিয়ে গেছে স্টেশনে সে শব্দ হিচককের মাথাতেই আসতে পারে। তারপর যেভাবে সেই পরিচ্ছন্ন বাবু-যুবক, শোনা যায়, বহুকাল বশ্বেতে দুলালকে ওয়াচ রাখত, যাতে সে ফোনে, চিঠি বা অন্য কোনো উপায়ে কোনো খবর না দিতে পারে। এ ব্যাপারে শোনা যায়, বিষ্ণুপদরা সি. বি. আই. পর্যন্ত গিয়েছিল। অবশ্য শোনা কথা, শান্তনু এ ব্যাপারে মোটেই সিঁওর নয়।

বিপদ হল এই, বিষ্ণুপদর দল দুলালের উপর ওই যুবক মারফত বা কিংবদন্তীর সেই সি. বি. আই.-এর মাধ্যমে যেভাবে নজর রাখত, তা গৌরীর কানে আসত, নানাভাবে, তার মাসীর চিঠির মারফত হয়তো বা। আর তাতেই গৌরী মনে করত, এ সবকিছুর পেছনে শান্তনু আছে। তাই আর সে শান্তনুর দিকে সহজে তাকাতে, কথা বলতে বা ভাত বেড়ে দিতেও পারত না। অন্যদিকে বিষ্ণুপদরা সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিল, আমরাই, যেভাবে হোক, দুলালের বন্ধুদের খবর দিয়েছি। যত দিন যাচ্ছিল, তত তাদের সন্দেহ বাড়ছিল।

সন্দেহ তাদের শান্তনুকেই বেশি।

সুতরাং একদিন অবধারিত হ'ল দুটি বাক্য :

এক. গৌরী থেকে : তুমিই বিষ্ণুপদদের আমার পিছনে লাগিয়েছ। আমি তো ঘরের বাইরে যাই-ই না, তবু যদি যাই, ওরা ছায়ার মতো আমার পিছনে থাকে। আর তুমি যতক্ষণ স্কুলে থাক, ওরা আমাদের সদরের কাছে সারাক্ষণ ঘোরাফেরা করে। এ অসহ্য!

দুই. বিষ্ণুপদ থেকে : আপনি বেশি কথা বলবেন না, মাস্টারমশাই, আমাদের এখন

গভীর সন্দেহ, আপনি ওদের অ্যার্ট করে দিয়েছেন। আমাদেরই ভুল, আপনাকে বিশ্বাস করে, প্রথম প্রথম আপনার উপর তেমন ওয়াচ রাখা হয়নি। আপনার স্ত্রীকেই আমাদের বেশি সন্দেহ ছিল, তাই আমাদের ফুলফোর্স আপনার স্ত্রীর পেছনে ছিল।...না, আপনার কোনো কথাই আমরা শুনব না।

এই হচ্ছে সেই শান্তনু, যাকে দুজনেই কান ধরে টানছে।

আসলে মজা এই, খুব উঁচু চেয়ারে বসে প্রকৃত শত্রুপক্ষ, যিনি এই সর্বকিছুর মালিক, তিনি জ্বর এক চোট হেসে নিচ্ছেন, কেননা তারই চোখের সামনে, দুই বাম জ্বরদন্ত হেনস্থা করছে শান্তনুকে, হায়, মালিক নিজে কোথায় তাকে হেনস্থা করবে, তার আগেই গোরী বা বিষ্ণুপদরা তাকে হেনস্থা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এ কি মালিকেরই জাল পাতা?

সে তো দেখছে, তার জন্য ছুরি শানাচ্ছে বিষ্ণুপদরা আর সন্দেহের কাঁটা দিয়ে ক্ষতিবিক্ষত করছে গোরী।

একদিন গোরীকে বলতেই হল, আর তো পারা যায় না। যথেষ্ট হল, আর না। এবার এসো আমরা আলাদা হই। এ শান্তনুকে বলতেই হল একদিন। কেননা সন্দেহ এমন এক সম্পর্ক যা শত্রু এলিয়েনেশনের দিকেই যায় না, উপরন্তু এমন এক ধরনের আক্রোশের দিকে যায়, যেখানে মানুষের নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ থাকে না। নতুবা গোরী স্বয়ং একা ভাঁড়ার-ঘরে শূন্যে বলতে পারে কি, ‘আজকাল তোমার বোধ করি ঘেন্না হয় আমাকে, আমার শরীরকেও? আমি ছটফট করছি কিনা, ঘুমুচ্ছি কিনা, একবার এসে দেখ?’

হায়, কে কাকে কী বলছে? কার কথা কে বলছে? কে যাবে ভাঁড়ার-ঘরে? যে দুচোখ দিয়ে দেখছে অন্যজনের সর্বদাই কুণ্ঠিত কপাল, ভারি মুখ, একবারও তার দিকে না তাকানো শূন্যে চোখ? সে কি পারে? ফলে আরও ভাবতে হয়, ছেড়ে দাও, ওকে দাও ছেড়ে, ও বোধহয় অনুপস্থিত দুলালের ভূমিকা পালন করতে চায়, ওকে দাও ছেড়ে।

সত্যি তখন শান্তনুর সঙ্গে গোরীর প্রকৃত সেপারেশন হবার অবস্থা। আর এই অবস্থার সঙ্গে ঘরে-বাইরের নিখিলেশের সঙ্গে তার এই জনাই এত মিল যে সেও একদা লিখেছিল “আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাইনি, এতে সকলেরই অপ্রিয় হয়েছি। দেশের লোক ভাবছে, আমি খেতাব বা সিকিউরিটি চাই কিম্বা পদাধিকার ভয় করি; পদাধিকার ভাবছে ভিতরে আমার কুমতলব আছে বলেই বাইরে এমন ভালোমানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলছি।”

শান্তনু এভাবেই চলতে চলতে একদিন তাদের স্কুলের অঙ্কের টিচার বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নজরে পড়ে গিয়েছিল।

কিছুটা মায়ের মতো, নাকি সবটা বন্ধুর মতো টোনে তিনি বলছিলেন,

—এ কী চেহারা হয়েছে আপনার ?

শুনে শান্তনুর কান্না এসে গিয়েছিল। তার মনে পড়ে গিয়েছিল, কতদিন গৌরী স্কুলে আসার আগে তাকে ভাত বেড়ে, বাটিতে বাটিতে ডাল-তরকারি-মাছ সাজিয়ে রান্নাঘরে চলে যেত। মদহৃত দাঁড়াত না। আর সে শান্তনু চোখের জলে ভাত খেয়ে উঠত। মায়ের চিতার আগুনে চোখ লাল করত। সে যে শ্মশানে মায়ের বন্ধু ঘি-মধু মাথাবার সময় মায়ের শুন দেখে একদা বন্ধুতেই পারেনি, একদিন ঐ বন্ধু মধু গন্ধে সে বড় হয়ে উঠেছিল, সে-সব মনে করে তার সাধের মাছের টুকরো না খেয়ে সেটা কোনো অনাহৃত কাককে ছুঁড়ে দিয়ে সে প্রত্যহ স্কুলে আসত। কোনোদিন এর অন্যথা হত না।

—এ কী চেহারা হয়েছে আপনার ? এ বাক্যে সেই স্বর্গীয় মা-ও ছিলেন। শান্তনু মাথা নিচু করেছিল ভাগ্যিস, স্টাফ-রুমে কেউ ছিলেন না সেদিন। তখন ছুটির ঘণ্টা পড়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস তখন কেবল তারা দুজনেই খাতা দেখাছিল। ভাগ্যিস তার চোখ দিয়ে কখনো জল পড়ে না।

আর একটি কথা না। চুপচাপ কিছুক্ষণ থাকার পর বিনয়বাবু নিজের খাতাগুলো জায়গা মতো রেখে, তার খাতাগুলো টেনে গুঁছিয়ে, দাঁড়িয়ে বেঁধে, স্বস্থানে রেখে শান্তনুকে নিয়ে উঠে পড়েছিলেন। বাইরে বোরসে রিক্সা চেপে সোজা এসেছিলেন তাঁর জি. টি. রোডের চেম্বারে, যেখানে তিনি জ্যোতিষার্ণব বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

চেম্বারে বসে একজন মহিমকে ডেকে আটটা রাজভোগ আনিয়োছিলেন রাহালেনের বিখ্যাত চাচার দোকান থেকে। চারটে নিজে গোপ্রাসে খেয়ে বাকি চারটে শান্তনুকে জোর করে খাইয়ে তিনি হাত-মুখ মুছে একটি বড় মাপের আত্মস কাঁচ হাতে নিয়ে বলছিলেন, দাঁখি আপনার হাত।

বিনা বাক্য ব্যয়ে অন্তত ১৫ মিনিট দেখেছিলেন। তারপর জানতে চেয়েছিলেন, তার ডেট অব বার্থ। সব মোটামুটি জানালে তিনি কাটাকুটি খেলার মতো ছক কেটে আরও ১৫ মিনিট কাটিয়ে বলছিলেন, রাহদর দশা। খানিক চুপচাপ থেকে প্রায় ডি. আই. বি. ইনস্পেকটরের মতো তার অতীত নিভুল বলে গিয়ে—তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, ১৯৮০ থেকে আপনার সময় ভালো যাবে। এখন রাহদর দশা চলছে।

রাহদ কী বা কে, এ প্রশ্ন জাগার আগেই তিনি বলতে শুরু করেছিলেন, এ হল জ্যোতির্বিজ্ঞান, লোকে অবশ্য জ্যোতিষশাস্ত্র বলে। আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এটা সত্য। আপনার সাম্প্রতিক গোলমালের কারণ এই রাহদ—এঁর স্বভাবই হল গ্রাস করা। ১৯৭৯ পর্যন্ত এঁর দশা চলবে। তারপর প্রায় মদুখস্থ বলার মতো শুদ্ধ বাংলায় বলে গেলেন, ‘রাহদ আসলে এক দানব। বিপরীত দানবের ঔরসে ও দাঁতের কন্যা সিংহিকার গর্ভে উৎপন্ন চতুর্দশ সন্তানের অন্যতম। সমুদ্র মন্থনের পর বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করে যখন দেবগণের মধ্যে সুধা ভাগ করে দিচ্ছিলেন, সেই

সময় এই রাহু দেবরূপ ধারণ করে দেবতাদের সঙ্গে অমৃত পান করবার জন্য এক সঙ্গে বসেন। এঁর গলা পর্যন্ত অমৃত গেলে চন্দ্র ও সূর্য এঁকে চিনতে পারেন। তৎক্ষণাৎ তাঁরা বিষদ্রুপ কাছে এঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন। তখন বিষদ্রু নিজের সুদর্শন চক্রে দিয়ে এঁর মস্তক ছেদন করেন। কিন্তু অমৃত গলা পর্যন্ত পান করার ফলে রাহুর মৃত্যু হল না। এঁর মস্তকভাগ রাহু ও দেহভাগ কেতু নামে খ্যাত হল। তখন থেকেই চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে রাহুর চিরশত্রুতার সূত্রপাত। রাহু তাই এঁদের গ্রাস করে ফেলেন। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করলে চন্দ্রগ্রহণ হয় ও সূর্যকে গ্রাস করলে সূর্যগ্রহণ। ...রাহু নবগ্রহের একতম ও নৈঋত কোণের অধিপতি। ...রাহুর রথ ধূসর বর্ণ। এই রথ আটটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব কর্তৃক বাহিত হয়। এই অশ্বরী একবার মাত্র রথে যুক্ত হয়ে সবসময় রথ বহন করছে। অর্থাৎ রাহুর রথ ছুটছে তো ছুটছেই। ননস্টপ ছুটছে। ভাবুন, আপনি সেই বিরামহীন রাহুর প্রকোপে পড়েছেন, যে থামতে জানে না। সহসাই এই জায়গায় শান্তনুর মনে পড়েছিল ঋত্বিক ঘটকের ‘অমান্থ্রিক’ ছবির কথা। সেখানে একটি সাদামাটা কিশোর একটি স্থির অটো পেয়ে তার পাইলট হয়ে স্টার্ট দিয়েছিল সেই গাড়ি আর স্টপ করতে পারেনি কেননা সে ব্রেক কষতে জানত না। তার স্করধ্বংস ‘থামতে পারছি না’ বহুকালাবধি বদকে বেজোঁছিল শান্তনুর; পুনরায় বেজে উঠল সেদিন।

সেদিন ওই বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছ থেকে ফিরে অকারণ, বিনা প্র্যানে সে ঢুকে পড়েছিল এক পাঞ্জাবী হোটেলে। যার দো-তলায় দিশি মদ বিক্রি হয়। অনেকদিন আগে মাঝে মাঝেই এখানে আসত শান্তনু। তখনো মনে হত, তার বড় দৃঃসময় চলছে। কিন্তু এই এখনকার অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে, বাস্তবিক সে সময়টা বড় সুখের মনে হয়। হারমন হেস ঠিকই বলেন, কেউ যদি আমার দৃঃখের দিনগুলি নিতে চায়, বদলে দিতে চায় তার সুখের দিনগুলি, আমি অন্তত রাজি হব না। আসলে দৃঃখের দিনগুলির সঙ্গেও জড়িয়ে থাকে মানুষ, তাদের কারুর কারুর সঙ্গে জড়িয়ে যায় ভালোবাসা। মানুষ সব পারে কিন্তু ওই ভালোবাসার স্বাদ একবার পেলে তাকে কিছুতে ছাড়তে পারে না। শান্তনু এক পোয়া, অর্থাৎ ১০০ মিলিলিটার দিশি মদ চেয়েছিল। পেয়ে চুমুক দিতে যাবার আগে, ওঃ, কী গন্ধ, যেন পৃথিবীর প্রথম ক্ষেত থেকে তোলা আদিতম ধান এতদিন বৃষ্টিতে ভিজছিল, সেরকম নষ্ট, পচা, গন্ধ— শান্তনুর পেট গুলিয়ে বমি এসেছিল। বহুদিন পর বলেই হয়তো কিংবা এই স্টাফটাই খারাপ, শান্তনু আর রিতীর চুমুক দিতে সাহস পাচ্ছিল না। একজন হোটেল-বরকে দেখে সে একটি কোকাকোলা চেয়েছিল। তারপর আর কষ্ট হয়নি। কোকাকোলা মিশিয়ে খেতে প্রায় হুইস্কি খাওয়ার টেস্ট পেয়েছিল শান্তনু। যেখানে বসেছিল সে, সেটা অনেকটা কোঁবনের মতো, সেখানে ক্রমে অন্ধকার করে আসছিল। একে অল্প আলো, তার উপর শান্তনুর চোখ ঝাপসা

হয়ে যায় পেটে মদ পড়লেই। তার জিভে এক ধরনের জড়তা আসছিল, যা স্বাদ হলে উঠেছিল অল্প কিছু পরেই। চতুর্দিক থেকে কালো মেঘ জমে উঠেছিল। এক সময় মাথার ভিতর সপ্রতিভ ঝোড়ো হাওয়ার সেই মেঘ আক্রোশে আটখানা হয়ে যেতে থাকল। ঘোড়ার খুরের শব্দে ভরে গিয়েছিল স্মৃতি। আশ্চর্য, কী করে পারা যায়, শূন্য মাত্র জন্ম সময়, তারিখ, জন্ম সন ও ডেট অব বার্থ জেনে অতীতের কথা প্রায় হৃদয় বলতে? তবে কি সে আগামীকাল কী করবে নির্দিষ্ট হয়ে আছে পূর্বেই? তাইতো থাকার কথা কেননা ক্যারাকটারই তো ডেস্টিন। এই যে সে বিপদের মধ্যে আছে, এতো তারই ক্যারাকটার। সে পক্ষও নেই, বিপক্ষও নেই—তখচ পক্ষ যখন তার ডান কান ধরে টানে বা বিপক্ষ যখন তার বাম কান ধরে টানে সে তো সাড়া দেয়। কখনো মনে হতে পারে সে দক্ষিণপন্থী, কখনো মনে হতে পারে সে বামপন্থী। সে মানুষ বলেই এটা স্বাভাবিক। কেন প্রধানত বা কাউন্সিলও তো তাই। এমনকি লুই ফিসার, আঁদ্রে জিদ আর এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি? বি. টি. রোডের ধারের জনমানব ছেড়ে আমরা সবাই তো বিবরে যাই। কিংবা উটেটটা, বিবর থেকে উঠে আসি কোনো সূর্যোদয়ে এবং বেলাবেলি চলে যাই বি. টি. রোডের ধারের জনমানবের কাছে। তবে কেন গোঁরীরা বোঝে না, কেনইবা বিষ্ণুপদরা ভুল করে? এঁকি তার ক্যারাকটার? ডেস্টিন? হোরিডিটি!...আঃ, না, আমাকে তুই আনলি কেন! আমি তো জন্মাতে চাইনি।

সৈদিন, যা হয় না সচরাচর, তাই হয়েছিল। শান্তনু গান গেয়ে উঠেছিল। প্রথমে মনে মনে, তারপর বৃকের মধ্যে গুড় গুড় করে মেঘ ডেকেছিল। এক অসম্ভব দৃংখ পাক খেয়ে উঠেছিল পেট খালি করে গলায়, আর তখনি, কীসের থেকে কী, সে নিজের দু'হাত ও দু'পায়ের পাতা ঘামিয়ে গেয়ে উঠেছিল : দৃংখের তিমিরে—যদি জ্বলে—তব মঙ্গলালোক—তবে তাই হোক—তবে তাই হোক—ক তবে তা—ই হোক।

না, শান্তনুর চোখ দিয়ে কখনো জল পড়ে না।

যদিও আট ঘোড়ার এক ধূসর রথ বার বার তার মাথার উপর দিয়ে ঘব্বর করে যাচ্ছিল আর যাচ্ছিল। কখনো তার চুল স্পর্শ করছিল, কখনো করছিল না। এক সময় সেই রথের পিছনে তার চুল সমেত সে যেন আটকে গিয়েছিল। কত পরে বদুবেছিল শান্তনু, রাহু তার চুল ধরে আছে। তার মাথা কেবল চুল সুবাদেই রাহুর হাতে ধরা আর দেহভাগ পড়ে ছিল পথে। ক্রমে রথের বেগ বেড়েছিল। তাকে ক্ষতিবিক্ষত করে কখনো পাথর কখনো বরফের উপর তার ওই মাতৃস্নেহন্য দেহভাগ শান্তি পাচ্ছিল। সমস্ত আকাশ গুম গুম করে রাহুর মৃৎসর্বস্ব ছিন্নকণ্ঠ থেকে দৈববাণী হচ্ছিল, 'কেন তুই জন্মেছিলি ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫-এ?'

—কেন আপনি বিষ্ণুপদদের খবর দিলেন?

শান্তনু এই দৈববাণী শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে কিছু পরিষ্কার হয়ে বলতে গিয়েছিল,

—আমি, আমি কী করব? আমি কি তার জন্য দায়ী?

— কেন আপনি বিষ্ণুপদদের খবর দিলেন ?

— কে, কে তুমি ?

— যেই হই, আপনি এই এলাকার আমাদের এনটি বন্ধ করে দিয়েছেন। বিষ্ণুদের সঙ্গে আপনার দহরম-মহরম, আপনি তাদের পা চাটতে চান। আবার জ্যোতিষ-কেন্দ্রে ঢুকেছেন। বসে বসে যে মদ গিলছেন, সে তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি।... আপনি জানুন, আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত এই, আমরা প্রতিক্রিয়াশীলদের পিঠের চামড়া তুলে নেব।

— ইয়াকি' পেয়েছ ? আমি এখুনি লোক ডাকব।

— ডাকুন !

বলে বলে সে, কে যেন, তাকে একটি খাঁকি রঙের খাপে পোরা ভোজালি দেখিয়েছিল। শান্তনুর মূখে আর সোঁদন কথা সরেনি।

— আপনি সাবধান থাকবেন। মনে রাখবেন, আপনার জন্য আমাকে মেয়েমানুষ পর্যন্ত সাজতে হয়েছিল।

বলে সে, কে যেন, অদৃশ্য হয়েছিল।

ওঃ, তাহলে গোরী এভাবেই ওদের সতর্ক করার সুযোগ পেয়েছিল, ওই কে যেন এক মেয়েমানুষের সাহায্যে ! সে আরেক পোয়া মদ চেয়েছিল, কেননা তখনো কোকাকোলা থেকে গিয়েছিল ও বিপদ বাড়িছিল।

বিনয়বাবু বলেছিলেন, আজকেই সময় প্রশস্ত ছিল, অন্তত ৫ রাত্তির গোমেদ যদি ধারণ করতেন, যাকে আপনারা টোপাজ বলেন, তাহলে কিছুটা রিলিফ পেতেন। এই আসানসোলের প্রচণ্ড গরমে, রোদে, ছাতা যেমন, সানগ্লাস যেমন কাজ করে তেমনি রিলিফ।

না, তা কী করে হয় ? গোমেদ ধারণ করবে ! রাহুর জন্য গোমেদ ! রিলিফ ? গোমেদ তাকে রিলিফ দেবে ? তার কী ক্ষমতা ? এক রত্তি পাথর পারবে কী করে তার সমস্যা মেটাতে। এতো কিছু সহজ সমস্যা নয় বা দৈব সমস্যাও নয়। এ সমস্যা মূলত রাজনৈতিক হলেও, এ সমস্যা তাকেও বিরত করছে। কোনো ঘটনা কোনো কিছু বা কেউ তো বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তার চেহারা রাজনৈতিক থেকে পারিবারিক হয় মাত্র। এ সমস্যা মেটাতে হলে এ দেশের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মেটাতে হয়। খুনোখুনি রাজনীতির ফয়সালা করতে হয়। দ্রব্যমূল্য কমাতে হয়। অল্প ভাড়া অল্পত দুখানা শোবার ঘর পেতে হয়। মানুষের মন থেকে সন্দেহের কাঁটা উপড়ে ফেলতে হয়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ দূর করতে হয়। এত সব পারবে কী করে ওই এক রত্তি পাথর ?...

পারল। সেইদিন পুনরায় তার মাথার উপর দিয়ে আটঘোড়ার রথ ঘর্ষর করে ঘুরে ফিরে আসতে লাগল আর যেতে লাগল। তাকে হিড় হিড় করে টানতে লাগল খরখরে পথের উপর, উঁচু-নিচু জি. টি. রোডের উপর তাকে মৃদু-মৃদু-মৃদু ট্রাফিকের ফাঁকে-ফাঁকে এঁকে-বেঁকে প্রায় আছড়াতে লাগল, আশ্চর্য, মাথার পিছন ছাড়া তার যেন আর সব অঙ্গত থাকছিল। একবার সে দেখাছিল বিষ্ণুপদকে, আরেকবার সে দেখাছিল গৌরীকে। সবার মুখ অসম্ভব গম্ভীর ও কেউ তার দিকে তাকাচ্ছিল না। শূন্য একবার বিষ্ণুপদ যেন কোথা থেকে ঝড়ের মতো ছুটে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।...

—এ কী মাস্টারমশাই, ভাবাই যায় না, আপনি— আপনি মাল খাচ্ছেন?

ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল শান্তনু, কেননা বাস্তবিক, বিষ্ণুপদ তার সামনে। সে লুকোবারও সুযোগ পায়নি। কার এসব ফাঁদপাতা যে একে একে সবাই এই কোবনে এসে হাজির হচ্ছিল? এরপর কি গৌরী আসবে?

—কার খোঁজ করতে এসে কাকে দেখলাম। এত উচ্ছ্বসে গেছেন আপনি? আপনি না গুরুমশাই, টিচার? যা হোক এখন আমার মোটে সময় নেই। এখানে কেউ কি এসেছিল? কাউকে দেখেছেন? আমাদের মতো কেউ?

স্বপ্নের মতো আবছা যাকে সে দেখেছিল ভোজালি হাতে, তার কথা সোঁদন বলতে পারল না শান্তনু, কেননা কান টানলে মাথা আসার মতো গৌরীও এসে পড়ত, কেননা সে তো মেয়েমানুষ সঙ্গে গৌরীর কাছে গিয়েছিল এবং তাকে পেয়ে গৌরী যা করার করেছিল, কবে কে জানে! গৌরী ধরা পড়লে সেও কি নিশ্চার পাবে?

—এটা কি তাহলে মিটিং-প্লেস? সেও ঢুকল আর আপনিও এখানে বসে! আগেই সন্দেহ করেছিলাম, আপনি ওদের দালাল। দাঁড়ান, আপনার ব্যবস্থা পরে হবে, আগে তো তাকে ধরি।

বলেই ঝড়ের মতো যেমন এসেছিল বিষ্ণুপদ তেমনিভাবে চলেও গিয়েছিল।

সেইদিন সন্ধ্যার পর শান্তনু আবার গিয়েছিল বিনয়বাবুর কাছে। না গিয়ে উপায় ছিল না। একজন তার পিঠের চামড়া তুলতে চায়, আরেকজন তাকে দেখে নিতে চায়। সে একা কী করবে। আর এই সমস্যা কে মেটাবে। না পারে বিষ্ণুপদ না পারবে গৌরী। তার কথা একমাত্র ভাবে বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তার কাছেই সে তাই গিয়েছিল। যখন কোনো বড় সমস্যা ছোট ছোট সমস্যায় টুকরো টুকরো হয়ে এক একজনকে গ্রাস করে, তখন যদি সে বড় সমস্যার মূলোচ্ছেদ না করতে পারে, তখন যদি তার সংগঠন না থাকে বা কোনো সংগঠনেই যদি তার ঠাই না হয়, তখন কে আর আসবে সমাধান করতে। তাকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। বেশ তো তাই হোক। গোমেদ ধারণ করে তার স্পর্শে সে বাঁচুক, তাতে কার কী। সে যদি মদ খেতে পারে, তাহলে গোমেদের কাঁধে হাত দিয়ে সে নিজেকে বাঁচাবার উপায়ও খুঁজে নিতে পারে। দুঃখের ভীমরে যদি জ্বলে তব

মঙ্গলালোক— তবে তাই হোক । তাই হোক ।

বিনয়কৃষ্ণ চেম্বারে একা ছিলেন । তাকে দেখে তিনি কিছুদ্ধকণ অবাক হ'লেও তারপর বরাভয়ের একপ্রকার হাসিও রেখেছিলেন মৃদুতে ।

—কী হ'ল আবার ।

যা হ'ল তা খুব দ্রুত হ'ল । বিনয়কৃষ্ণর কাছে একটি রূপোর আংটির মধ্যে সিলোনিজ গোমেদ বসানো ছিল, কার জন্য বানানো কে জানে । হয়তো বা তারই ভবিষ্যৎ । সেই আংটি সমেত নিজের বাড়িতে শান্তনুকে নিয়ে গিয়ে তিনি হাতমুখ ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে একটা ধোয়া ধুতি পরে খালি গায়ে ঠাকুর ঘরে গিয়েছিলেন । সেখানে ১৫ মিনিট প্রায় কাটিয়েছিলেন আংটি নিয়ে এক অনাধিক ৩ ফুট লম্বা কালীমূর্তির পদতলে । ততক্ষণে তাঁর নির্দেশ মতো শান্তনু হাত মুখ ধুয়ে প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে তাঁরই এক নতুন জোড়া ধুতি পরে দাঁড়িয়েছিল ঠাকুর ঘরের সামনে । এক সময় তাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে বলে প্রায় আদেশের সুরে বলেছিলেন, 'দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করুন ।' পরে স্বয়ং দাঁড়িয়ে আরও বলেছিলেন, 'নৈঋত কোণে মুখ করে দাঁড়ান ।' এ কথায় আদেশ ছিল না । কেননা তিনি জানতেন যে শান্তনু নৈঋত কোণে কোনদিকে জানে না । সেভাবে দাঁড় করিয়ে পুনরায় আদেশের সুরে বলেছিলেন, 'দক্ষিণ অনামিকা প্রসারিত করুন ।' শান্তনু তাই করেছিল, এটা সে জানত । তিনি সেই সচন্দন আংটি তার আঙুলে পরিয়ে দিতে দিতে বিড়বিড় করে বলেছিলেন, 'শান্তনুকেও বলতে বলেছিলেন, 'ও' ঐ' হুইং রাহবে নমঃ ।' ওই মন্ত্র অসংখ্যবার তিনি প্রম্পট্ করেছিলেন, যা না শুনতে বলা যায় ১০৮ বার ।

তার ডানহাতের রিং-ফিংগারে গোমেদ প্রথমেই তেমন জ্বলজ্বল করেনি । চন্দন উঠে গেলে চকচকে হ'ল । ইলেকট্রিক লাইটের নিচে আশ্চর্য্য দ্যুতি খেলেছিল এক সময় । এই গোমেদ বা টোপাজ হ'ল পদ্পরাগমণি, এক ধরনের পাথর, পোথরাজ, বিনয়কৃষ্ণ বলেছিলেন । আরও বলেছিলেন প্রথম গ্রিস এর মূল্য বুঝে রত্ন হিসেবে অলঙ্কারে ব্যবহার করত । রোমানরা এর নাম দেয় । ব্রাজিল, রাশিয়া, মোক্কিকো ও সিলোনে এই পাথর ক্রমে রাজরাজাদের মুকুটে, বালায়, কণ্ঠে দুলতে থাকে । চীন প্রায় আধুনিককালে সেই আফিং যুদ্ধের সময় এই রত্নের ব্যবহার শুরু করে । তার হাতের এই গোমেদ আদিত্যে ছিল হলুদ, ব্রাজিলের টোপাজ প্রচণ্ড তাপ দিয়ে প্রথমে গোলাপি, পরে সিলোনে আরও তাপ দিয়ে রক্তিম করা হয় । এর রক্তিমতা অনেকটা সর্বের তেলের মতো । একদা এই রত্ন প্রায় হীরের কাছাকাছি একপ্রকার পাথর ছিল । প্রথম তুষার যুগের আগে পৃথিবীর গাছপালা ছিল এখনকার থেকে অনেক বড় বড়, অতিকায় । তখনকার ঘাস ছিল এখনকার হোগলা বনের মতো । ঘাসের আরেক সহোদর বাঁশগুঁড়ি

ছিল অস্বাভাবিক মোটা, বড় বড় পাইন গাছের গাঁড়ির মতো। বট-অশ্বথ গাছ তখন ছিল না কিন্তু তাদেরই প্রাপ্যতমহারা ছিল অসম্ভব বিশাল। তারপর ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে মাটিতে শূন্যে পড়েছিল। ভূকম্পনে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, ৪০ দিন ৪০ রাত্রির অবিরাম বৃষ্টিপাতে, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থেকে গ্লেন্সিয়ার নেমে আসায় যখন সমস্ত পৃথিবী বরফে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, তখন মাটির অনেক নিচে পড়ে গিয়েছিল এই সব মৃত গাছগাছালি। কম বেশি দু'হাজার বছর ও-রকম পড়ে থেকে, তারা মাটির তলায় সকলেই কিন্তু কয়লা হয়ে যায়নি, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অগ্ন্যুত্তাপে কিছু কিছু হীরেও হয়ে গিয়েছিল। তাদেরই এক সহোদর এই হলুদ গোমেদ। পুনরায় তাপ পেয়ে তার হাতে রক্তিম হয়ে জ্বলছিল সে-সময়। আঃ ভোলা যাবে না তার বরাভয় ঔজ্জ্বল্য !

এর পরে যা ঘটল, ঘটনা হিসেবে তা বহুল হলেও শান্তনু ২/৪ কথায় তা বলে দিতে পারে। কেননা শান্তনু স্বভাব-দুঃখী। সে দুঃখের কথায় বড়। সে যদি পদ্য লিখত, তাহলে তার নাম এতদিনে 'কবিকঙ্কন' হয়ে যেত, অন্তত 'পেসিমিস্ট' তো হতই। কিন্তু গোমেদ ধারণ করার পর, যে কোনো কারণেই হোক, তার দুঃসময় কেটে গেল। তখন ১৯৭২ সাল। তার দুঃখের সময় শূন্য হয়েচে। এই দুঃখের কথায় শান্তনু প্রায় মূক। যখন বিষ্ণুপদরা ও গৌরীরা মৃধোমুখি গোলাগুলি চালাচ্ছিল ও চালাতে চালাতে উভয়েই প্রায় শেষ যখন, তখন আর শান্তনুকে পায় কে ! তার আগে বলা বাহুল্য ওরা উভয়েই তাকে কম হেনস্তা করার চেষ্টা করেনি। কিন্তু তখন তার হাতে গোমেদ। বিনয়কৃষ্ণ তখন তার সহায়। তিনিই উপায় বের করেছিলেন। সি. পি. আই.-এর গণ-ফ্রন্টে নিয়মিত বক্তৃতা দেওয়া এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যবস্থা করলেন। কসবার সেই হোলটাইমার এখন যিনি সি. পি. আই., তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ হয়েছিল। বিনয়কৃষ্ণ দিয়েছিলেন একটি টেলিফোন নাম্বার : 21581। প্রয়োজন হলে এই নাম্বারগুলি ডায়াল করলে কেউ তার গায়ে হাত দিতে পারবে না। ওই নাম্বার-গুলি যে অফিসের সেখানেও গিয়েছিল শান্তনু। না সঙ্কেচ হয়নি ডি. আই. বি. অফিসে যেতে। কেন সঙ্কেচ হবে? সবাই তো যায়। কে যায় না? আর এ সবের মধ্য দিয়েই একদিকে সংগঠন হিসাবে সি. পি. আই. অন্যদিকে রাষ্ট্র হিসেবে ডি.আই.বি. শান্তনুর হাতে গোমেদ থাকতেই বোধকরি কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল ক্রমে।

এসবই অবশ্য বিনয়কৃষ্ণের তৎপরতা। তিনি বিনয়ী, বলেছিলেন, গোমেদের ছত্রছায়ায়। হয়তো তাই। সেজন্য শান্তনু অচিরে আসানসোল ছাড়বার ঝোঁকে চাকরি পেয়েছিল কোলকাতায়, নামী পার্বালিক স্কুলে। এক লাফে তার মাইনেও হয়ে গিয়েছিল ৫৯৯ টাকা ৮০ পয়সা।

আবার শান্তনুরা চলে গিয়েছিল কোলকাতায়, যেখান থেকে একদা এসেছিল

আসানসোলে। তখন ১৯৭২ সাল।

কালবৈশাখী ঝড়ে যেমন ক্যালেন্ডার উড়ে যায় তেমনি করে শান্তনুর চোখের সামনে উড়ে গেল ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫ সাল।

ঘটনা বদলাতে থাকল।

মুখোমুখি লড়ল সি. পি. এম.—নকশাল। এশিয়ার নব সূর্য জন্ম নিল ভারতবর্ষে। যুদ্ধফ্রন্ট ভেঙে গেল। নব-কংগ্রেস জন্মাল। চারু মজুমদার মারা গেলেন। জেলে নিহত হ'ল নকশাল। সি. পি. এম. কিছুর মরল নকশালদের হাতে, কিছুর নব কংগ্রেসের প্রহারে, কিছুর জেলে, কিছুর বসে গেল। বাকি সব জ্যোতির্ময়রা বিধান ও লোকসভার কাঁধে হাত রেখে এখানে সেখানে গেলেন পরে আরেকবার জেগে উঠতে!

শান্তনুর দিন খুলে গেল। ১৯৭৫-এর ২৭শে জুন জরুরী-অবস্থা জারী হবার ৭২ ঘণ্টা পর শান্তনুর হাতের রক্ত এক আশ্চর্য কাণ্ড করল। তার সেই অতীতের গুরু, হোলটাইমার, যিনি কসবায় থাকতেন, তিনি তো সি. পি. আই.-ই ছিলেন, একদিন হঠাৎ দেখা গড়িয়াহাটার মোড়ে। ভাবাই যায়নি শান্তনুকে চিনতে পারবেন তিনি। শব্দ চেনা নয়, প্রায় বৃকে জড়িয়ে বলোছিলেন, 'উঃ কর্তাদিন খুঁজোঁছ তোমাকে। সেই চারু মজুমদার মারা যাবার আগে তোমার খবর পেয়েছিলাম, শুনোঁছি তোমার ক্রাইসিস কেটেছে কিন্তু ডিটেল কিছুর খবর পাইনি। ব্যাপার কী?...'

কে জানত তখন এই হোলটাইমার তাকে এনে দেবে অনির্বচনীয় হৃন্ডি; কে জানত তিনিই শান্তনুর জন্য খুঁজে দেবেন তেল-সোনা-কাগজের খনি; আহা, কে জানত এরই দৌলতে, সে শান্তনু আলো, অন্ন, আকাশ ও নারীকে কিছুর সন্নিহিত ভাবে পেয়ে যাবে। কাকতালীয়, কিংবা হোলটাইমার নতুন ওই গোমেদ শান্তনুকে ১৯৭৭ সালেই দিয়েছিল কলেজের চাকরি।

অবিশ্বাস্য হলেও এটা ঘটনা, অধ্যাপনার চাকরি সে পেয়েছিল আসানসোলে। স্কুল থেকে ছ'মাসের লিয়েন নিয়ে সে অ্যাকসেস্ট করেছিল লেকচারারের পিওরাল টেমপোরারি পোস্ট। ছ'মাস করে লিয়েন নিয়ে সে ভেবোঁছিল অধ্যাপনা করে যাবে। তারপর কী হয় কে বলবে? এসবের মধ্যেও গোরীর একটা ব্যাপার বরাবরই ছিল, যা শান্তনুর সহ্য করার কথা নয়, তবু সে সহ্য করছিল। কিন্তু কী করে যে করছিল, সে নিজেই জানতে পারছিল না। এও গোমেদের বরাভয় কি না কে জানে।

ব্যাপার এই, গোরী কিছুর্তেই ওই গোমেদ সহ্য করতে পারছিল না। প্রথম দিন শান্তনু অবশ্য কিছুর্তেই বলেনি। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে গোরী যখন নিজে নজর করেছিল, তখন পুরনো দিনের মতোই খুব উৎসাহ নিয়ে সে সব কথা বলোঁছিল। রাহুর পুরাকাহিনীও সে বলোঁছিল। অনেক কিছুর্তে যোগও করেছিল। যেমন রাহুর আট আটটি কালো

ঘোড়ার উপর গোমেদের দ্ব্যুত, শান্তনু বলেছিল, টোপাজের ব্রাইটনেস, যখন কাজ শুরুর করে, তখন ঘোড়াগুলি মেরুন রঙ পায়, প্রতি সূর্যোদয়ে তারা ক্রমে যুবনাস্ব হতে থাকে। তখন আর রথের রঙ ধূসর থাকে না, রূপময় হয়। গৌরী কিছু শোনেনি। মাঝে মাঝে মেয়েরা যেমন পাষণ হয় তেমন নয় বরং ইডিপাস-কমপ্লেক্সে ভোগা শাশুড়ির মতো, পুরুষধূর রূপে যে মোটে মৃগ্ন হয় না, ঠিক তেমন। হীরে-চুনীর সগোত্র প্রায় উজ্জ্বল গোমেদের দিকে সে তাকিয়েও দেখেনি। স্বভাবতই গোমেদের দৌলতে কোলকাতায় চাকরি হলে গৌরী খুশি হওয়া দূরের কথা, প্রচ্ছন্ন ঠাট্টাই করেছিল। ভাবাই যায় না, সেই গৌরীই বলেছিল, ‘যাক গোমেদ তাহলে দেখছি মেকলে সাহেবের ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থা! তোমাকে ঠিকই সাচ্চা শহর বা কোলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে। যে কোলকাতা কিনা সাম্রাজ্যবাদীদের মৃগয়াক্ষেত্র! অবশ্য নিশ্চয় এখন তুমি আর এ-সব কথা কোলকাতা নিয়ে বলবে না, কেননা এখন কোলকাতা নিশ্চয় তোমার কাছে নকশালদের আঁতুর ঘর।’

ভাবা যায়, এই গৌরীই একদিন কোলকাতা থেকে আসানসোলে এসে মৃগ্ন তার করে ছিল। ভাবা যায়, এই গৌরীই একদা প্রিকা দেখত শান্তনুর জন্য। কোলকাতার কর্মখালিগুলি টুকে রাখত দুপুরে না ঘুঁমিয়ে। শান্তনু স্কুল থেকে ফিরলে অতি উৎসাহে দেখাত। এসব ভাবা যায় না।

কিন্তু আবার আসানসোলে ফিরে আসা এবং ১৯ বছর স্কুল করে দিল্লীর মতোই দূরের নাগালের বাইরের, অধ্যাপনার পদ পাওয়া, এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা নেই ওই গোমেদ ছাড়া! গৌরী অশ্বি সাত বছর পর না খুঁশি হয়ে পারল না।

আর তাই এই জাগরণ বহুকাল পরে গৌরীকে হাতের মুঠোয় পেয়ে সে কিছু করেছিল। গৌরীকে কোলকাতায় রেখে সে একা গিয়েছিল আসানসোলে। না গিয়ে উপায়ও ছিল না। আবার ছিলও। কেননা দুনিয়ার সবচেয়ে ওঁছা বাসাবাড়ির শহর, আসানসোলে এমনিতেই ভাড়া বাড়ি পাওয়া পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য, তবু লেখালেখি করে গৌরী তার আসানসোলের একমাত্র বন্ধু নমিতাদের ফ্ল্যাটে সাময়িক থাকার একখানা ঘরের ব্যবস্থা ভালোই করেছিল।

কিন্তু শান্তনু ‘আগে ভাব বুঝে আসা যাক’, এই লজ্জকে একাই যেতে পেরেছিল বিনা বাধায়। বলা বাহুল্য, ভাব বুঝে আসা কথার কথা ছিল। শান্তনু ঠিকই করেছিল অন্তত তিনবছর গৌরীকে সে আসানসোলে নেবে না। কেননা তার পোস্টটা ছিল এক ধরনের ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সি যা তিন বছরের, পরে পার্মানেন্ট হ’লেও হ’তে পারে। ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের প্রদত্ত ভারতবর্ষের তাবৎ কলেজের লেকচারারদের ৭০০-১৬০০ স্কেলের সহযোগী আরেকপ্রকার স্কিমের অন্তর্গত এই ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সি। ঘটনা এই, ৭০০-১৬০০ টাকার স্কেলের সুযোগ দিয়ে ওই কমিশন চেয়েছিল অধ্যাপকদের আরও শিক্ষিত করতে। সেই সুবাদে রিসার্চের স্কেপ দিয়ে কমিশন কিছু অধ্যাপকদের হায়ার-স্টাডির জন্য তিন বছরের রিসার্চ কোর্সের ব্যবস্থা করেছিল। এরকম

একজন অধ্যাপকের তিন বছরের জন্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়া কাজে লাগিয়েছিল ওই গোমেদ। সেই খালি পদে তিন বছরের জন্য অধ্যাপনার চান্স পেয়েছিল শান্তনু। স্কুলে প্রায়, এরকমকে শান্তনুরা ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সি বলে।

গোমেদ সবই দিয়েছিল কিন্তু ওই ৭০০-১৬০০ দিতে পারেনি। বদলে দিয়েছিল যা তা, গৌরীকেও প্রথমে রিপোর্ট করতে তার লজ্জা লেগেছিল, সেটা ছিল প্রথম কিছুকাল পূরনো ৩০০-৪০০ স্কেলের ৩০০ টাকা সঙ্গে কলেজীয় মাগণী ভাতা ১৭.৫০ পয়সা, মিলে ৩১৭ টাকা ৫০ পয়সা। ভাবা যায় না। কিছুতেই ভাবা যায় না যে এর নাম অধ্যাপনা। কিন্তু অধ্যাপনা তো সেই সুযোগ যা পাবার জন্য প্রাইমারি টিচার ইস্তক সকল শিক্ষকই দিবারাত্র স্বপ্ন দেখে। কেননা অধ্যাপনা হল সেই সেরেস্তা, আপাদমস্তক যেখানে ২৪ ঘণ্টার ব্যস্ততা রেখে বস্তুত বছরে, বলা যায়, সর্বোচ্চ মাত্র ৩৬৫ ঘণ্টা কাজ করে ৩৬৫ দিনের মাইনে পাওয়া যায়। কিন্তু ৭০০-১৬০০র যুগে যদি মাত্র ৩১৭ টাকা ৫০ পয়সা পাওয়া যায়, যা রেভেন্যু স্ট্যাম্পের দৌলতে সে সময় ২০ পয়সা কাটা যেত তাকে অন্তত অধ্যাপনা না বলে, অবৈতনিক বয়স্ক শিক্ষার সাম্মানিক শিক্ষক বলা ভালো। শুধু ভবিষ্যতের আশায়, যাকে বাণিজ্যে স্পেকুলেশন বলে, শান্তনু মেনে নিয়েছিল সেই অধ্যাপনা। বলা যায় কোলকাতার পাবলিক স্কুলের ৬০০ টাকার হক ছেড়ে মাত্র ৩১৭ টাকার অধ্যাপনা মেনে নেয়া শান্তনুর সেই ধৈর্য বা মোটা চামড়া, যার তুলনা একমাত্র গুডারের সঙ্গেই চলে।

ঘটনা যাই হোক সেই ৩১৭ টাকা ৩০ পয়সায় সে যে কীভাবে ১০ মাস ১০ দিন চালিয়ে ছিল, আজও ভাবতে গিয়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু সে পেরেছিল। এর চেয়ে ৩০০ টাকা বেশি পেয়েও কোলকাতায় তাকে হিমশিম খেতে হয়েছিল। সে পেরেছিল শেষমেষ টিউশনির জোরে, যা তার জুড়ে গিয়েছিল ওই গোমেদীয় অধ্যাপনার দৌলতে, কিছুকাল পরে যা গৌরীও জানে না, কিন্তু তা কোনো মাসেই ৭০০ টাকার কম না। অর্থাৎ শান্তনু আসানসোলে এক সময় রোজগার করছিল ছলে-বলে-কৌশলে প্রায় ১০০০ টাকা, যাকে তারা ফোর ফিগার বলে।

এতেই গৌরী, কোলকাতায় একা, ক্রমে বদলে যেতে থাকল। কেননা প্রত্যেক মাসেই স্বামী যদি শাড়ি অথবা প্রেসার কুকার, স্টেনলেস স্টিলের থালা অথবা বেডকভার, বর্ধমানের মিহিদানা সীতাভোগ অথবা নাইটি ব্রা এনে দেয় তাতে দুনিয়ার কোন বোঁ না খুঁশি হয়! আর গৌরী বোঁ ছাড়া তো হাতি-ঘোড়া আর কিছু না, ওই সেই মেয়েমানুষ, যার সোনার হাতে সোনার কাঁকন দেখে পুরুষের মতিভ্রম হয় : কে কার অলঙ্কার! কিন্তু ১৮ মাস পর অধ্যাপক সর্মিতার ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোডের অফিসে জুড়তোর ক্লেপসোল ক্ষয় করে শান্তনুরা যখন ৯০০ টাকা মাস মাস পেতে আরম্ভ করেছিল, তখন মেজাজে টিউশনি ছেড়ে শান্তনু হাত-পা ধুয়ে একবার কোলকাতা গিয়েছিল গৌরীর জন্য নিজের টাকায় কেনা বেনারসী শাড়ি কিনে। সম্ভবত সেই প্রথম বাঙালী মধ্যবিত্ত, অন্তত

শিক্ষক, যে বিবাহের বেনারসী ভাঁজে ভাঁজে জীর্ণ হতে দিয়েও স্মৃতি নয়, নিয়মিত ব্যবহারের জন্য কিনেছিল কাতান বেনারসী। যার মধ্যে বৈবাহিক তত্ত্বের গন্ধ ছিল না। রাধা অন্তত একবার জ্যোৎস্নাভিসারে এরকম বেনারসী পরে কুঞ্জে গিয়েছিল বলে অনুমান করলে অন্যায় হবে না, বরং ভারতীয় কৃষ্টি করা হবে।

সেই বেনারসী শাড়ি যার দাম ৩৭৫ টাকা ছিল, শান্তনু জীবনে কখনো কিনতে পারবে বলে স্বপ্নও দেখেনি, তা হাতে পেয়ে গোরীর সেই ব্রাইট মুখ, একমাত্র গোমেদই পারে যার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে, যে মুখের দিকে তাকিয়ে মারাঠী বা পার্শী অ্যাডভারটাইজার বলে উঠেছিল ‘দারুণ সব কাপড় দারুণ সব জায়গায় আপনারই প্রতীক্ষায়’...গোরীর সে মুখ ভুলবার নয়। তার কাঁচের চুড়ির মতো শব্দ করে হাসা, এরপর যত দুঃসময়ই আসুক শান্তনুর, সে ভুলবে না সেই হাসি, Even a cloudburst can't dampen her enthusiasm অর্থাৎ সেই হাসি। না, এরকম হাসিতেই যে কেবল গোরী বদলে যেতে থাকল কোলকাতায়, একা,—তা বললে কিছদ্র ভুল বলা হয়ে হয়ে যাবে। গোরী নিতান্ত মেয়েমানুষ হলেও, সে যেমন মেয়ে, তেমনি তো মানুষ। মানুষের হাসি মেয়ের ঠোঁটে এলেই বা কী, তার বদলে যাওয়া যে কোনো ঋতুর বদলে যাওয়ার মতই সমগ্র সৌর-জগতের ব্যাপার। আসলে সে বদলাল তখনই যখন তার সূর্যই তাকে ঠেলে দিল বাইরে কিংবা সে নিজে যখন তার সূর্যের দিকে হেলে থাকা পালটে নিল। কেটেকুটে এও তো সৌরজগতেরই ঘটনা।

হ’ল কী একদিন, আসানসোল থেকে ফিরে, কোলকাতায় এসে, শান্তনু দেখল গোরীর সূর্যকে, যেন ডাইং সান। দেখে অবাক হয়েছিল। দুলালকে ওভাবে আবার কখনো দেখবে ভাবেনি শান্তনু। ভেবেছিল, শনিবারের বদলে শুক্রবারে এসে, সে নিজে গোরীকে কিছদ্র অবাক করে দেবে, কেননা সাধারণত সে শনিবার ফেরে, সোমবার তার অফ, কিন্তু কলেজে স্ন্যাক সিজন বলে কথা, যখন মাত্র একটি ইয়ারকে পড়াতে হয় বলে সপ্তাহে ক্লাস থাকে বড় জোর ৪, ফলে মাত্র ২ দিন ক্লাস নিলেই সপ্তাহে যথেষ্ট, যার দৌলতে তার শনি, সোম ও মঙ্গলের উষা বন্ধে পা অফ-ডে হচ্ছে—এত অফে ভরা অধ্যাপনার অত্যাশ্চর্য্য সময়ে, সে কিন্তু পারেনি গোরীকে অবাক করে দিতে। বদলে, আগেই বলা হয়েছে, সে নিজে অবাক হয়েছিল দুলালকে দেখে। রীতিমত জেন্টলম্যান তখন দুলাল। ছিমছাম সূক্ষ্ম গৌফের রেখার উপর সেই পরিচ্ছন্ন নাক, যা তখন উন্মাসিক হতে পারত কিন্তু না হয়ে হেসেছিল অদ্ভুত। সেই হাসিতে স্মৃতি ছিল না, একটা অন্যরকম রিলেশনের এনিটিটি ছিল। এমন কি পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করেছিল। সে প্রণাম না নতজানু, শান্তনু কোনোদিন তার ব্যাখ্যা পাবে না। কেননা জীবনে প্রথম সে পেয়েছিল সেই প্রণাম, যা বাঁ হাতের করতলে টেনে নিয়েছিল তার ডান পদতল এবং বলাই বাহুল্য, ডান করতলে সে, দুলাল, টেনেছিল তার বাম পদতল। সেই টানার মধ্যে কোনো ফর্মালিটি না, বিলক্ষণ বিনয় ছিল, বদ্বী বা প্রায়শ্চিত্তও। নতুবা বলত কি, ‘আমার সৌভাগ্যে,

আপনার দেখা পেলাম, এসেই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল সব শূনে, কিন্তু কালকে না এসে, আজকে এলেন, আমারই সৌভাগ্য ! আমি তো লেকচারারশিপ পাওয়ার কথা জানতাম না !...আসলে আপনারা যে এখানে আছেন এখন, এই জেনেছি ৩/৪ দিন হল —আজকে ছাড়া আমার আর আসা হত না, আর হবে কিনা তাও জানি না । কালই আমাকে দিল্লী যেতে হবে । কবে ফিরব জানি না, সেখান থেকে হস্ত বাইরেও যেতে হতে পারে ।’

—কেন, এখন কী করছ ?

—সি. এম. ডি. এ.-তে আছি ।

—বাঃ !

—ও তোমার নাম করে পিপিণ্ড থেকে দেখ না কত কী এনেছে !

কান না দিলেও, নারী কণ্ঠে না আসত যদি, তবু চোখ না তুলে বলা যেত যে কথাটা গোরীর ।

—আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন ।

এটা দুলালের । এ বলার মধ্যে আগের কোনো ব্যাপারই নেই কিন্তু এ যেন ও পার থেকে বলা, মাঝখানে কত জল যেন বয়ে যাচ্ছে ।

—তোমার জন্য আরও কত কী এনেছে, এসেই দেখ না ।

সেই গোরীই বলল । কোথায় যেন বদলে যাচ্ছে তার ভয়েসও । কী যেন হয়েছে তার ! কী ? শান্তনু দেখল, হাত-মুখ ধুয়ে এসে, ওল্ড মোনাকের আফটার শেভ্ লোশন, শেভিংক্রিম ; রোমানিয়ার গ্যাস লাইটার, ইউ. কে.-র পার্কার পেন, গ্রুনাডিগ্ টেপারেকর্ডার ।

গোরীর হাসি, দুলালের বহু দূর থেকে কানে কানে কথা বলার এফার্টলেস গলা, শান্তনু ভুলে যাচ্ছিল স্মৃতি, সে দুলাল সম্পর্কিত সত্তরের কৌতূহলগুলিকে অনায়াসে পারাছিল নেভাতে, যেন এক ধরনের গেটটুগেদার হচ্ছে, যেন সবাই মোটাসোটা গোলগাল ; যেন সবারই চুলে পাক ধরেছে ; যেন সবারই গালগুলি ভারি ; যেন সবারই পায়ের তলায় মাটির বদলে লিনোলিয়াম ফ্লোর, যাকে সুখী গৃহকোণ, শোভে গ্রামোফোন বলে । না, তাই বলে দুলাল কিছু গ্রামোফোন আনেনি । এনেছিল পিপিণ্ড থেকে স্মোকড্ মার্টন্ ফ্রায়েড রাইস, বয়েলড্ প্রন ইন্-মাস্টারড্, প্রন চাউ, স্মোকড্ সসেজ, চিকেন রোস্ট । বলার নেই যে গোমেদের অমোঘ ক্রিয়ায় গোরীর সূর্য বদলে যাচ্ছে ।

রাত ঠিক ৯টায় বেরিয়েছিল সেই মূল্যবান সিঙ্গাপুরী ক্যাসের বাসন, শেষ কবে বেরিয়েছিল মনে পড়ে না । আঃ তার ঠুনঠান আওয়াজ মূহূর্তে মানুষকে নিয়ে যেতে পারে ফাইভ্-স্তারে । যে জন্য ওই বাসনের পিছন পিছন টোবলের উপর এল ইঁজপিশিয়ন কটনের দামি চাদর, যা একদা তারা বিছানায় পেতেছে, বিয়ের জল যতদিন শুকিয়ে যায়নি গা থেকে ততদিন । সেই ধবধবে সাদা সাহেবী চাদরের উপর ডেস্ করা খাবার, সবচেয়ে

তাক লাগানো ডেস ছিল স্যালাডের ; গৌরী করেছিল ডিম, পেঁয়াজ ও মাত্র শশার কুচি দিয়ে । না, পুরনো কোনো কথা হয়নি । এক্ষেত্রে পুরনো কোনো কথা হয় না ।

শোবার বিছানা পাতা হ'ল আরও অদ্ভুত । তাদের ২ ঘর বিশিষ্ট বাসার বাইরের ঘরে দুলালের বিছানা হল মেঝেতে । গৌরী নিজে শোবার ঘরে বিছানা পাতল তাদের দুজনের, একান্তে । প্রতিবাদ করেছিল শান্তনু । ব্যবস্থাকে উল্টে দিতে চেয়েছিল, তারাই দুজনে মেঝেতে শোবে আর দুলাল যাবে শোবার ঘরে । হয়নি । দুলাল দেখনি হ'তে ।

কিন্তু শান্তনুও সহজে শূতে যায়নি গৌরীর কাছে, দুলালের কাছে বসেছিল কতক্ষণ কে জানে । একে একে আলো নিভেছিল । গৌরীও 'দেঁর কোরো না শূতে' বলে শূতে চলে গিয়েছিল, তার ঘরেরও আলো নিভে গিয়েছিল । শূধু জ্বলছিল আলো এই বাইরের ঘরে । যেখানে সে ও দুলাল একতক্ষণ প্রায় কথা বলছিলই না বলা যায় । কিন্তু চতুর্দিক নির্জন হয়ে গেলে, পাথার শব্দে মাত্র সময় বয়ে যেতে থাকলে, কথা শূদ্ধ করেছিল দুলাল ।

—লাইটারটার ইউজ দেখিয়ে দি !

সে লাইটার খুঁজছিল, যা তখন শোবার ঘরে । নিয়ে এসেছিল শান্তনু । একটা বাক্স । খুলে দুলাল বার করেছিল একটা ছোট পিস্তল । সঙ্গে একটি পলিথিনের টিউব । গায়ে লেখা 'ইকন', লেখা Butelie, আরও লেখা Atenji Inflamabili, তলায় Made in Romania, টিউব দেখিয়ে বলেছিল দুলাল, এই টিউবে যে লিকুইড আছে, সেটা, হাইল ইনফ্লেমেবল, এই দেখুন টিউবের মাথায় সিরিঞ্জ, লাইটারের গায়ে.....বলে সে পিস্তলটি নিয়ে তার হাতলের একটি ঢাকনা চাপ দিয়ে খুলল, দেখা গেল গায়ে ছোট একটি পিনহোল, সেখানে টিউবের সিরিঞ্জ লাগিয়ে সে চাপ দিল, একটা প্রেসারের আশ্চর্য শব্দ হল, দুলাল বলল, 'এভাবে এই লাইটারে এই লিকুইড ইনজেক্ট করতে হবে । তারপর দেখুন'...বলে সে টিউব রেখে পিস্তলের 'হাতলের ঢাকনা বন্ধ করল । তারপর পিস্তলের ট্রিগারে হাত দিল—ছোট পিস্তল, কোনো ব্যাপারই না, তবু দেখে শান্তনুর বুক ফাঁকা হয়ে গেল । ট্রিগার টিপল দুলাল । গ্যাস জ্বলে উঠল । আবার ট্রিগার টিপল, গ্যাস নিভে গেল । দম ছেড়ে শান্তনু বলল, 'বুঝেছি' । তখন দুলালের চোখ দুটি মৃত ইলিশের চোখের মতো অপলক, খোলা, চকচকে । সে সেই চোখ ঘুরিয়ে পাশে রাখা ভি. আই. পি. স্মটেকস খুলল । বের করল একটি হলুদ রঙের সিগারেটের প্যাকেট । গায়ে লেখা 'State Express 555 International'— 'নিন খান', বলে দুলাল প্যাকেট খুলে একটি সিগারেটের মাথা বার করে শান্তনুর দিকে এগিয়ে দিল ।

—সে কী ! আমি তো চার্মিনার খাই ।

—হ্যাঁ এবার থেকে আপনি এই সিগারেট খাবেন । দশ প্যাকেট এনেছি । রোজ দশটার বেশি খাবেন না । এতে দিন কুড়ি চলে যাবে । আমি আবার পাঠাব ।

সিগারেট ঠোঁটে নিল শান্তনু। পিস্তলে ট্রিগার টিপল দুলাল। গ্যাস জ্বলল। এবার আর ভয় করল না। সিগারেট ধরাল শান্তনু। আবার ট্রিগার টিপল দুলাল। গ্যাস নিভে গেল।

—আপনি কি এখনো কানিট্রি লিকার খান?

—না, না তো।

—আর থাকেন না। এখন থেকে আপনি থাকেন এই জিনিস। বলে দুলাল তার সন্টকেস থেকে বার করল একটি পেটমোটা কালো বোতল। ঘর গায়ে সোনালী অক্ষরে লেখা ওল্ড হোরিটেজ, তার নিচে লেখা : স্পাইসড স্কচ হুইস্কি...সেগুঁড়ির ওল্ড...‘ব্ল্যাক হর্স’। বোতলের ছিপি খুলে টোঁবলে রাখা কাচের গ্লাসে ঢালল, অনেকটা জল মেশালো পাশের জগ থেকে। বলল, ‘খান’।

—ব্যাপার কী?

—আপনার জন্য এনেছি, আপনি ব্যবহার করলে শান্তি পাব।

—তুমি একটা সিগারেট নাও।

—না, সিগারেট আমি আর খাই না।

—বেশ, তাহলে এই ড্রিংকসই নাও।

—না, আমি ড্রিংকস নিতে পারি না, আমার অ্যালার্জি আছে। আপনি খান। আমি দেখব।

শান্তনু চুমুক দিল। অশ্রুত স্বাদ। ঝাঁঝালো, মিষ্টি।

—সিপ করুন, একসঙ্গে থাকেন না, কিক হবে। শান্তনু আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে এক সময় গ্লাস ফাঁকা করল। কোনো কথা আর হল না। শান্তনুর কাজ শুরুর হল প্রথমে মাথায়, তারপর সর্বত্র। শান্তনু শুষ্টে পড়ল দুলালের বিছানায়। দুলাল তার পায়ের কাছে বসল।

—আপনাকে আরেকটা জিনিস দেব।

শান্তনু বড় করে চোখ খোলার চেষ্টা করল। পারল না। তবু দেখল, আবার দুলাল তার সন্টকেস থেকে কী যেন বার করেছে। দেখল, একটি ডাইরির মতো পকেট বুক।

—একটা ফোল্ডার, হাতে নিন।

শান্তনু হাতে নিল।

—এখন খুলবেন না। কাল ভোরে খুলবেন।...এখন আপনি এটা হাতে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। বলে আবার দুলাল তার পায়ের কাছে বসল। শান্তনু ধরে রইল সেই ফোল্ডার, যা সে ডাইরির মনে করেছিল। কী আছে এই ফোল্ডারে তা জানবার কৌতুহল পর্যন্ত ভালো কাজ করছে না। শুনল দুলাল বলছে :...‘আপনি গোমেদ নিয়েছেন, ভালো, আমরা আসলে নষ্ট হয়ে গেছি। আমাদের হাড়ে ঘন ধরেছে। আপনি ভোরে যখন

ফোল্ডার খুলবেন, সব বন্ধাবেন। আসলে আপনাকে খতম করার দীক্ষা যার কাছে থেকে পেয়েছিলাম তিনিই এখন এক গুরুদ্বার কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তাঁকেই একমাত্র বাবা বলে ডাকেন। সেই বাবার কোথাও ছিটেফোঁটা আর লাল নেই।...তিনি লাল রঙকে অধর্ম মনে করেন। আর আপনি যার কাছে যাবেন ভেবেছিলেন বাঁচার জন্য, তিনি এখন এম. এল. এ. তাঁর অসুখ হলে আসানসোলের তাবৎ বড় ডাক্তাররা বিনা কলে দেখতে আসে। এখন কোথাও কোনো সূর্য নেই, দিনের কাস্তিময় আলো বা বাতাস কোথাও আর অবশিষ্ট নেই। আপনাকে তাই রাহু গ্রাস করার সুযোগ পায়। কিন্তু ভাবুন, আমি তো কোনোকালেই রাজনীতিতে ছিলাম না, অথচ একেবারে রক্তাক্ত রণাঙ্গনে গিয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সকলের পেরেন্ট বডি সি.পি.আই., একা হয়ে নষ্ট হতে থাকল। তারপর একা হল সি.পি.এম.। এখন কী ভয়ংকর একা সি.পি.আই.(এম.এল.)। বাবা যদি ঘৃষ্যথোর হয় আর ছেলে যদি তাকে ত্যাগ করে চলে যায় তাহলে ঘৃষ্যের বদলে উৎকোচ ছেলেকেও এক সময় গ্রাস করে। ব্যাপার যা থাকার, তাই থাকে। আপনি একা থাকবেন না কখনো। একা হলে ওই ফোল্ডারটি দেখবেন। আমি আর আসব না। এই শেষ।...

তারপরেও কোনো কথা দুলাল বলেছিল কিনা, জানার উপায় নেই আর, কেননা বেলা করে পরের দিন ঘুম থেকে উঠে সে প্রথম মুখ দেখেছিল গৌরীর। তার স্নান হয়ে গেছে। চোখ স্বচ্ছ। মুখে হাসি। সহজেই বলল, ও চলে গেল, তোমাকে ডাকতেই দিল না। তোমার চা আনি?

শান্তনুর সব মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল ফোল্ডারের কথা। এখন কি ভোর? তবু সে খুলল ফোল্ডার। যা তার আর হাতের মূঠোয় নেই। বিছানার পড়ে আছে। খুলে দেখল, তিনটি রঙিন ফটো। মাঝখানে রামকৃষ্ণ, বাঁদিকে বিবেকানন্দ, ডানদিকে সারদাদেবী। রামকৃষ্ণের পরনে লাল কাপড়, বিবেকানন্দের পরনে গেরুয়া, আর সারদাদেবী লালপেড়ে কাপড় পরে আছেন। তাঁর কোলে হলুদ ফুল, সূর্যমুখী।

চা নিয়ে হতবাক হয়ে দাঁড়াল গৌরী। গৌরীর পরনে সাদা শাড়ি। চুল ভেজা। শান্তনু তার আঙুলের গোমেদের দিকে তাকাল। আদর করল। গোমেদ অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছে। যে জন্য দুদৃশও পার হল না, গৌরী গোমেদের রেফারেন্স বিনা বলেছিল, তুমি বোধহয় ভুলে গেছ আমারও ডেট অব বার্থ ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫ সাল।

শান্তনু মৃহুর্ত দাঁড় করল, বলেছিল, 'ভুলব কেন, জানি, মনে আছে।' — তাহলে আমাকেও একটা গোমেদ দাও।

না, গৌরীকে বেনারসী শাড়ি দেওয়া যায়, এমনকি মুক্তোর মালাও দেওয়া যায়। কিন্তু গোমেদ দেওয়া যায় না। কেননা তখন ১৯৭৯, ১৯৮০ সাল বা শান্তনুর মোস্ট ইমপরট্যান্ট

টাইম হতে আর মাত্র এক বছর বাকি। এসময় অন্তত গৌরীকে গোমেদ দেওয়া যায় না। একই ডেট অব বার্থে জন্মানো আরেকজনকে, অন্তত সে যদি স্ত্রী হয়, তাকে কোনো মতোই গোমেদ দেওয়া যায় না। কেননা এই তো সবে গোমেদের জোরে গৌরীকে গ্রিপে পাওয়া। এরকম সদুসময়ে গৌরীকে গোমেদ দিয়ে সে কেন নিজের পায়ের তলার মাটি ছাড়বে?

সে মুখে বলল, নিশ্চয় দেব, কিছ্ছু অপেক্ষা কর। তোমার তো আমারই মতো ৫-৬ রতি গোমেদ দরকার, অন্তত ৬০০ টাকার ব্যাপার। দু-চার মাস লাগবে।

তখন জানুয়ারি ১৯৭৯। মেয়েমানুষেরা তারিখের হিসেব রাখে ভালো। সুতরাং গৌরীর বলতে দেরি হল না, সেভেনটি এইটেও তুমি প্লাস টু-র খাতা দেখে পেয়েছ সাড়ে পাঁচশ, সেভেনটি নাইনে পাবে না?

সহসাই— মনে পড়ে গেল শান্তনুদ্র, তার পার্বালিক স্কুলের হায়ার সেকেন্ডারি কোর্সের এগারো-বারো ক্লাস পড়বার দৌলতে সে হায়ার সেকেন্ডারি কার্ডিন্সলের ফাইনালের খাতা দেখেছিল ১৯৭৮ সালেই। এই ১৯৭৯ সালের মতো জানুয়ারিতে বোধ করি ফর্ম ফিল-আপ করেছিল। সাড়ে পাঁচশ'র কিছ্ছু বেশি টাকা পেয়েছিল।

—কী পাবে না?

—পাব।

—তবে?

—অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আসুক।

—তর্কির কর, সহজে আসবে কি? কিছ্ছু কি হয় সহজে, আজকাল, তর্কির ছাড়া?

—কেন আসবে না? গতবারই তো দেখেছি। গতবারই তো অ্যাপ্লাই করে নাম রোজার্শ্ব করছি।

—তুমি তো এখন প্রোফেসর।

—আমি তো এখনো ইলেভেন-টুয়েলভ পড়াই।

—সে কী?

—কেন, জানো না, ইলেভেন-টুয়েলভ কলেজেও আছে।

—সে কী?

—স্কুলেও আছে, কলেজেও আছে।

—তবুও তুমি খোঁজ নাও। স্কুলে যাও।

—গতবারে যখন ছিল, এবারেও থাকবে, ভেব না।

—কিন্তু এবারে যা পাবে, সব আমার, মনে থাকে যেন!

—ঠিক আছে। এবারের খাতা দেখার টাকায় তোমার গোমেদ সিঙর।

কিন্তু ওই গোমেদের কল্যাণেই কিনা জানা যাবে না কোনোদিন, তবু সেদিনই বিকেলে

তার প্রাক্তন স্কুলের অশোক মিত্রের সঙ্গে দেখা, যে আবার কলকাতা ডি.সি.-র এ.বি.টি.এ.-র একজরিকিউটিভ। কথার কথায় তার সঙ্গে খাতা দেখার প্রসঙ্গ। ভাগ্যিস দেখা হল, নতুবা সে জানতেই পারত না, পরের দিন লাস্ট ডেট, হায়ার সেকেন্ডারির খাতা দেখার জন্য আবেদন করবার। প্রত্যেকবারই আবেদন করতে হবে। সেভেনটি এইটের মতোই ছাপানো ফর্ম। যা প্লাস টু (হায়ার সেকেন্ডারি) স্কুলগুলিতে এক মাস আগেই এসে গেছে। যদি এক-আধটা থেকে যায় তো একমাত্র দিতে পারবে হেডক্লার্ক।

ছুটে গিয়েছিল শান্তনু তার প্রাক্তন স্কুলে। তখন সন্ধ্যা ৬টা। জানুয়ারিতে রীতিমতো রাত। তবু হেডক্লার্ক থেকে যায় যদি এই ভেবে সে এবং সেই ছুটে গিয়েছিল বললে একান্ত নেমকহারামি হবে, ছুটে গিয়েছিল গোমেদ। নতুবা হেডক্লার্ককে পাওয়ার কথা না। কী একটা কাজে ফেঁসে গিয়ে সে ছিল, তার থাকার কথা না। আর ফর্মও থাকার কথা না, তবু একটা অফিস-কাঁপ ছিল, যদি এমার্জেন্সিতে লাগে।

একেই বলে হুহুয়া কিংবা কুপা কিংবা কী বলবে, ভেবে পেল না শান্তনু, সে শুধু গোমেদের উপর হাত রেখেছিল। তারপর ফর্ম নিয়ে ট্যাকসি করে হো-চি-মিন সরণিতে গিয়েছিল। হায়ার সেকেন্ডারি কার্ডিন্সলের অফিসে। সেখানে ওই গোমেদ ধরিয়ে দিয়েছিল রিসার্ভিং সেকশনের ডিলিং ক্লার্ককে। না, সেদিনই গোমেদ পুরো কাজটা করতে পারেনি, কেননা ডিলিং ক্লার্ক বলেছিল, আজ রিসার্ভ করার উপায় নেই। কাল করবে, তা ছাড়া অর্থারটির সই লাগবে। অর্থারটি বলতে সেই ইনস্টিটিউট যেখানে সে ইলেভেন-টুয়েলভকে মার্ভ করে।

এখানেই আটকে গিয়েছিল শান্তনু। কেননা সেদিন আসানসোলে গিয়েও প্রিন্সিপালের সই নিয়ে পরের দিন ফেরা অসম্ভব। তবু সে একবার ভাবল, কী করা যায়! বাড়ি ফিরে গৌরীর সঙ্গে পরামর্শও করল, ঠিক আগের দিনগুলির মতো। এবং গৌরীও সেভাবেই মাথা ঘামাল সেই আগের দিনগুলির মতো। এমন কি গৌরী প্রায় ভুলে যাওয়া এক গাল হেসে বলেও ছিল,

—ভাবছ কেন? তোমার গোমেদ দেখো ঠিকই কোনো উপায় করে দেবে। না, এ কথায় কোনো বাঁজ ছিল না।

—এক কাজ করলে হয় না? আজ রাতে দিল্লী এক্সপ্রেসে যাও। খুব ভোরে প্রিন্সিপালের বাড়ি গিয়ে সই করিয়ে কোলিফন্ড এক্সপ্রেস ধরে চলে এস।

এরকম যে ভাবেনি শান্তনু তা নয় কিন্তু মূশকিল হচ্ছে, প্রিন্সিপাল তো ঠিক আসানসোল প্রপারে থাকেন না, তাঁর কলেজে আসতে আসতে বেলা এগারোটা বাজবে অর্থাৎ শান্তনুর বারোটা বাজতে আর বাকি থাকবে না, ঘড়িতে তখনো এক ঘণ্টা বাকি থাকলেও। অবশ্য একথা সে গৌরীকে বলল না, বলেওনি কোনোদিন। বললে বিপদ আছে। কেননা গৌরী প্রায়ই বলে, রাখ তোমার কলেজ—কলেজ যে আজকাল কত পাণ্ডুরাল হয় আমার জানা আছে। তখন তো শান্তনু পাণ্ডুরাল প্রিন্সিপালেরই দোহাই পাড়ে। এখন সব সন্ত্য

কথা বলে, এখনি বাকি সব কিছুর বারোটা বাজানোর কোনো মানে হয় না।

মুখে বলেছিল, স্ট্যাম্প পাব কোথায় শূদ্ধ সই করলে তো চলবে না, নিচে রবার স্ট্যাম্প তো প্রিন্সিপালের ঘরে থাকে না, থাকে হেডক্লার্কের ঘরে। যাকে বারোটার আগে পেতে গেলে ভগবানকে পাওয়ার জন্য যে সাধনার দরকার তার চেয়েও অনেক সাধনার দরকার হবে। তা শান্তনু পক্ষে আপাতত সম্ভব না। এই হেডক্লার্কের কথা সবিস্তারেই বলে শান্তনু। প্রায়ই বলে, কেননা এতে মাইনে-পত্র নিয়ে মাঝে মাঝে রাখাঢাকা যায় ওই ইরেগুলার হেডক্লার্কের দোহাই পেড়ে।

—আরেক কাজ করলে হয় না? তুমি তো আসলে এই স্কুলেরই টিচার, লিয়েন নিয়েছ, এই যা; ওতো ছুটি নেওয়াই হ'ল, এই স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছ থেকে সই নিলে হয় না?

বাঃ, শান্তনু মুখে না বলে পারল না। কে গোমেদ, গৌরী না শান্তনু? কার হাতে এখন গোমেদ, গৌরীর না তার? তবে কি এই টাকার গোমেদ হবে বলে গৌরীর গ্রহরত্ন এখন থেকেই কাজ শুরু করে দিল। শান্তনু আবার বলল, বাঃ!

এই বলার পর, যদিও রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা, শান্তনু ছুটল হেডক্লার্কের বাড়িতে। আসলে প্রিন্সিপালের কাছে যাবার সাহস নেই শান্তনুর। কেননা তাঁর একটা প্রিন্সিপাল আছে। সাবেক কালের অক্সফোর্ডের বি. এ.। এখানে সোজা আঙুলে ঘি তোলা শান্তনুর কন্ম নয়। বরং সে বাঁকা আঙুলে ঘি তুলুক।

তাই তুলল। হেডক্লার্ককে দিয়ে রবারস্ট্যাম্প, ওপরে হেডক্লার্কের ইলিজিবল সই। প্রায় প্রিন্সিপালের মতো। এটা হেডক্লার্কের দু-নম্বর কাজ। এরজন্য মেহনত করতে হয় না মোটে, শূদ্ধ হাতে কিছু গুজে দিলেই হল। যা দিতে গিয়ে, হয়ত বা গোমেদই, হেডক্লার্ক জিত কেটে, সে-কী, আপনার কাছ থেকে নেব? ধন্ম হবে না...বলে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

বাড়ি ফিরে আর্কিমিডিসের মতোই ইউরেকা বলে সইসাব্দদের ফর্ম গৌরীর চোখের সামনে মেলে ধরেছিল। তখন যদিও বাড়িতে ১০টা, তবু গৌরী চাইবার আগেই তাকে চা দিয়েছিল, এক কাপ।

—নাও, চা খেয়ে ফর্ম ফিল-আপ করে নাও। খেয়ে দেয়ে উঠে তো আবার তুমি মোটে কিছু করতে পার না।

করেছিল তাই! তার ডেট অব বার্থ সমেত ডিটেল বায়ো-ডাটা, আরো ডিটলে কোয়ালি-ফিকেশনের যাবতীয় এ টু জেড লিখে শান্তি-নীরবতা পালন করেছিল দুজনে দুর্মিনিটেরও অনেক বেশি।

সে রাত্রি ভুলবার না। বলা উচিত, ওই গোমেদ ভুলবার না। খেয়ে দেয়ে শান্তনু শূয়ে পড়েছিল বিনা প্যানে। কৃতজ্ঞতার মন ভরে গিয়েছিল! গৌরী এসেছিল সব কাজ মিটিয়ে অস্বাভাবিক তাড়াতাড়ি। আলো নির্ভয়ে শূয়ে পড়েই টেনে নিয়েছিল শান্তনুর

মাথা। পান খেয়েছিল গোরী। বিলক্ষণ জর্দা ছিল। বন্ধুর মধ্যে শান্তনুর মূখ এনে নিজের খুঁতনি রেখেছিল শান্তনুর কপালে। জিভ দিয়ে এ-গাল থেকে সে-গালে পান নিয়ে গিয়ে সে ঢোক গিলেছিল কৃতজ্ঞতায়। আঃ গোমেদ, ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে নমঃ, ১০৮ বার জপ করার আগেই আনন্দ পেয়েছিল শান্তনু প্রায় ৯ বছর পর।

পরের দিন সকাল ১০টায় ঠিক যে সময় আসানসোলে তার খাড' ইয়ার অনাসের ক্লাস, সেই সময় সে খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। হো-চি-মিন সরাণিতে পৌঁছতে পৌঁছতে তার ইলেভেন আর্টসের ক্লাস শুরুর হয়ে গিয়েছিল আসানসোল গ্যালারিতে।

কাউন্সিল অফিসের সামনে এসে আশ্চর্য্যে ছিমছাম শান্তনু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থেকে পাওয়া বিনয়ে মূখ নিচু করেই ঢুকছিল। কিন্তু ঢুকতে পারল না। তার মতো অনেকেই গেটের সামনে বসে। কে একজন দূর থেকে বলল, 'আরে ওই তো শান্তনু, বলিছিলাম না, ঠিকই আসবে!' তাকিয়ে দেখেছিল পোস্টার, ব্যানার, লাল শালুর ফেস্টুন এবং অনেকের মধ্যে অধীর দাসকে, তার একদা সহকর্মী। এগিয়ে এল।

—কবে পেরোঁছিস চিঠি? তাহলে আসানসোলে ১ দিনেই চিঠি যায়? সমীরের সন্দেহ ছিল, চিন্তাদারও ছিল আর রবিবাবুতো বলেই বসলেন, 'অসম্ভব!'

শুদ্ধ হাসি ছাড়া সহসা কিছু বলতে পারল না শান্তনু। বলতে দিলও না ওরা।—'যাক, আমাদের ভোলেননি তাহলে!...ভুলবে কেন, এতো ওরও ব্যাপার! আর তো মাত্র এক-বছর, তারপর ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে আসবে...আসলে তোর বক্তৃতা দরকার, মানে কথা বলা আর কী ওই চিমসে ডি. এস্. জি.-কে, তোর তো জানা আছে ভালো এই সব প্লাস টু-র ব্যাপার-স্যাপার।...'

বন্ধুতে সময় নিয়েছিল শান্তনু। যথাসম্ভব চোখ উজ্জ্বল রেখেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে একে-ওকে গ্লিট করে সে বুদ্ধিছিল, এটা অবরোধ। হায়ার সেকেন্ডারির নানা বুটকামেলার মীমাংসা। ইলেভেন-টুয়েলভ ক্লাস আলাদা স্ট্যাটাসে ইন্ডিপেনডেন্ট হবে কিনা? অর্থাৎ হওয়া উচিত। স্কুলে থাকবে না কলেজে থাকবে? অর্থাৎ স্কুলেও থাকবে না। একেবারে আলাদা থাকবে। কেননা কিছু প্লাস টু স্কুলে থেকে আবার কিছু প্লাস টু কলেজে গিয়ে নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। স্ট্যাটাস এক থাকছে না। স্কুলে ইলেভেন-টুয়েলভ পড়ালে ৩০০-৭০০ স্কেল, আবার কলেজে ওই ইলেভেন-টুয়েলভ পড়ালে ৭০০-১৬০০ স্কেল—এ কী ছেলের হাতের মোয়া? তাছাড়া স্কুলে এই প্লাস টু-র ক্লাস নিলে কেউ দেয় ৫০, কেউ কানাকাড়িও দেয় না। স্কুল আলাদা কোনো ঘর, অফিস, লাইব্রেরি অথবা ল্যাবরেটরি দেয় না। কোর্স হেভি। সিলেবাসের মাথা-মুণ্ড নেই। সেই সাবেককালের আই. এ., আই. এসসি., আই. কম. এর মতোই অথচ প্রিএমবল্-এ মস্ত মস্ত কথা। ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট একটা ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছু না। কোর্স শেষ করতেই পারা যায় না আবার ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট! শেষ পর্ষন্ত ফর্মের উপর আন্দাজে নম্বর বসিয়ে যাওয়া। কে আর নেয় ইন্টারনাল

অ্যাসেসমেন্টের জন্য টেস্ট? শেষ পর্যন্ত ক্লারিক্যাল জব করতে হয়। দিল্লী দিল্লী ফর্ম প্রাপ্তি পেপারে, ১০ নম্বরের মধ্যে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট, অর্থাৎ চোখ বুজে ৩/৪ মেরে যাওয়া, ২/১টি ভালো ছেলেকে ৫/৬—এর কোনো মানে হয়? হায়ার সেকেন্ডারির সব দায়টা যেন টিচারদের, ক্লার্করা কেউ কাজ করবে না। কেননা হায়ার সেকেন্ডারি তো না ঘরকা, না ঘাটকা। সেকেন্ডারি, হায়ার সেকেন্ডারি, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজ, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মিলেই আমাদের অ্যাকাডেমিক লাইন। এর মধ্যে সবার ঘর-বাড়ি, টিচার, পে-স্কেল আছে—নেই মাত্র হায়ার সেকেন্ডারির। এর বিহিত দরকার। হয় উঠে থাক, নয়তো আলাদা হয়ে বাঁচুক। ওই ডি.এস. গাঙ্গুলির কত প্রতিশ্রুতি ছিল : আলাদা বাড়ি হবে, আলাদা স্কেল হবে, আলাদা টিচার্স পদূল হবে। কাগজে ঘটা করে বিজ্ঞাপন হল। তারপর কোথায় কী। ডি.এস. গাঙ্গুলি এখন মূখ্য কালো করে থাকে। অথচ নিজের আলাদা চেম্বার, আলাদা অফিস, আলাদা স্টাফ, নিজের আলাদা স্টাটিস, আলাদা পে-স্কেল আর মরতে মরণ বার্ষিক্যালির মতো টিচারদের মূড়ি-মূড়িকির এক দর। না এ হতে পারে না। এ সবেরই সূচু রূপ দিতে এই অবরোধ। ডি.এস. গাঙ্গুলি এলে তাঁকে ঘেরাও। তাঁর কাছ থেকে লিখিত জবাব না পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে আটকে রাখা।

শান্তনুর বন্ধুতে বেলা গেল! তার চোখের সামনে অবরোধ। চতুর্দিকে তারই সহকর্মীরা। এদিকে ওদিকে পোস্টার। ব্যানার। ফেস্টুন। আর তার দক্ষিণ অনামিকায় গোমেদ। পকেটে হায়ার সেকেন্ডারির এগজামিনার হওয়ার জন্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম। আজই জমা দেবার লাস্ট ডেট। আর আজই যত বুট-ঝামেলা। শান্তনু কপাল না কুঁচকে পারল না। তাতে অধীর উৎসাহী হয়ে বলল, ‘এ জন্যেই তোকে লেখা। তুই এর এ টু জেড জানিস! ডি.এস. জি.-র সঙ্গে আমরাই কথা বলব, তুই শুধু ঠেকা দাঁবি, যদি ওই কালোমানিক কোনো পরেন্টে আমাদের চেপে ধরে, তুই সামলাবি।’

—আমি, আমি...

শান্তনু বলতে গিয়েছিল, আমি এর বিন্দু-বিসর্গ জানি না।... মনে মনে বলছিল, আমি অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে এসেছি, জমা দিয়ে চলে যাব। হ’ল না, কোনো কথাই বলা হ’ল না। অধীর দাস মোক্ষম অস্ট্রী ছাড়ল, কসবার পার্টি অফিস থেকে তোর ঠিকানা সংগ্রহ করেছে, তোর সেই গুরুর ঠিকানা দিলেন। তিনিই তো আমাদের কত কিছুর সাপ্লাই করলেন। তাঁর স্লেগান হল, ‘শুধু অবরোধ নয়, কার্ডিন্সল অফিস বন্ধ করে দাও। মনে পড়ল, অধীর এখন সি.পি.আই. করে। বামফ্রন্ট সরকার এখন। ওরা ফ্রন্টে নেই। ওদের এরকম বাম হওয়া তাই সাজে। এবং শান্তনুর সাজে না, সে যাই হোক, এখন আর ফর্ম জমা দেয়া, অন্তত এখনুনি, সাজে না।

—অশোকদা, অশোক মিত্রকে দেখাছি না যে!

—ওদের সমর্থন আছে। শুধু ডি.এস. জি.-কে অবরোধ করার ব্যাপারে এ.বি.টি.

এ-র সমর্থন নেই। ওরা মন্ত্রিমহল মারফত যা করার করবে, ওরা বামফ্রন্টে কথা তুলবে, ওরা প্রমোদ দাশগুপ্তকে ইনফ্লুয়েন্স করবে, ওরা চায় ডি. এস. জি.-র অপসারণ। ওরা অফিসিয়ালি আসতে চায় না। কিন্তু...ওই দ্যাক্ত অরবিন্দ এসেছে।

অরবিন্দকে এতক্ষণে দেখল। নিজের এগিয়ে গেল। বহুকাল পর দেখা। অরবিন্দর সেই হাসি এখনো ঠোঁটে লেগে আছে। চুল পেকেছে এই যা। চুটিয়ে সি. পি. এম. করে। অশোকদা বলেছিল কাল।

—কেমন আছ?

—কেমন আছ, শালা, প্রোফেসর হয়েছে না পেঁপে চোর হয়েছে, শালা ভুলে গেল।

মনে পড়ে গেল অরবিন্দর সঙ্গে তার তুই-তুকারির সম্পর্ক। শান্তনু হেসে অরবিন্দর দহাত নিয়ে কিছু ঘনিষ্ঠতা করল, নীরবে।

—তোর খোঁজ কতদিন পাই না। প্রায় ১০ বছর হল তুই আর তো কনফারেন্সে আসিস না। আসানসোলের সুধীরবাবুর সঙ্গে কথা হয়। তুই নাকি এ. বি. টি. এ. প্রায় ছেড়ে দিয়েছিস, চাঁদা দিস মাত্র।

—আমি তো এখন কলেজে আছি। অধ্যাপক সমিতি করি।

—জানি, জানি, দুদিনের যোগী, ভাতকে বলে অন্ন।

শান্তনু আবার হেসে অরবিন্দর দহাত নিয়ে ঘনিষ্ঠতা করল খুব। বলতে গিয়েছিল, আমি যেখানেই যাই, হায়ার সেকেন্ডারি ছাড়াইনি, আজ তো হায়ার সেকেন্ডারির এগজামিনার হবার জন্য অ্যাপ্রিকেশন জমা দিতেই এসেছি। বলা হল না, তার আগেই অরবিন্দ বলল, তোকে দেখে খুব ভালো লাগছে, আবার আমাদের মধ্যে এলি। বসে যাস না। বসে গেলে ফ্লাসট্রেশন আসে।

শুনে শান্তনু গোমেদ লুকাতে ডান হাত পাঞ্জাবীর পকেটে রাখল। সেখানেই তার গোমেদের হাত স্পর্শ করল দুলালের দেয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণাদির ফোল্ডার, যা পকেটেই ছিল, সেখানে চূপচাপ অ্যাপ্রিকেশন ফর্মও। তার হাত ঘামছিল। না, আপাতত এই হাত ও ওই ফর্ম সর্বসমক্ষে বের করা চলে না। সমাজ বলে কথা।

—আচ্ছা, আছিস তো এখন, পরে কথা হবে।

বলেই অরবিন্দ কী করতে যেন দোতলার সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল। ওই সিঁড়ি ধরেই কাউন্সিলের অফিস। আহা, শান্তনু তো কথা বলতে বলতে অরবিন্দর পিছন পিছন যেতে পারত, কোনো এক ফাঁকে সেই ক্লাকের হাতে গর্দজে দিতে পারত এই ফর্ম—

—তারপর শব্দে অবরোধ কেন, বিপ্লব করারও অসুবিধে থাকত না শান্তনুর। কিন্তু কিছুই হল না। এই সুযোগে নিজেকে কিছু ফাঁকা জায়গায় একা পেয়ে সে পকেট থেকে ডান হাত বের করল। গোমেদের দিকে তাকাল, কী পারবে না ফর্ম জমা দিতে? গোমেদ হেসে বলল, অপেক্ষা কর, সব পারবে।

সহসা তার সামনে সে 'চাঁদা যেন' এমন একজনকে দেখল।

—চিনতে পারছেন ?

চিনতে পারল শান্তনু। রবিবাবু। তার প্রান্তন স্কুলের হায়ার সেকেন্ডারির বায়ো-সায়েন্সের পার্টটাইমার। একদা কোনো কলেজে ছিলেন, রিটার্ড। যিনি শান্তনুর এখানে আসা নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, অসম্ভব।

—নিম সিগারেট খান।

তার হাতের উদ্যত প্যাকেটে অত্যধিক উদ্যত সিগারেট নিতে শান্তনুর সত্কেচ হল। বয়স্ক মানুষ। উপরন্তু জানা গেছে, তিনি এম. এস. সি. পাশ করেছেন ১৯৩৫ সালে। তার জন্মসালে। ভাবা যায় না। তার এখানে আসাও যেমন ভাবা যায় না। কেননা তিনি হায়ার সেকেন্ডারির বোধকারী একমাত্র সেই পার্টটাইমার, স্কুল থাকে মাস মাস ২০০ টাকা না দিয়ে পারে না। তার প্রান্তন স্কুলে বায়ো-সায়েন্সের কেউ নেই। এখন বায়ো-সায়েন্সের খুব ডিম্যান্ড। সেকেন্ডারি স্কুলে লাইফ-সায়েন্সের কল্যাণে ওদের দর বেড়ে গেছে। কার যে কখন পোষ মাস আসে, কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু রবিবাবুর সঙ্গে বেশি কথা বলে না সে। বলতে পারলও না। ততক্ষণে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য গোপালবাবু দাঁড়িয়েছেন। ইকনমিকসের টিচার, তাদের স্কুলে। একদা ডাকসাইটে সি. পি. এম. ছিলেন। এখন শোনা যায় বসে আছেন ও কোর্টিনস মেমোরিয়াল-এ কিছু একটা করেন। সর্বদা নিজের সম্বন্ধে কম কথা বলেন। অরবিন্দর বন্ধু।

—আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

রবিবাবু সরে গেলেন।

শান্তনু তারও দু হাত নিয়ে ঘনিষ্ঠতা করল। মুখে বলল, ভালো আছেন তো ? আজ সবার সাথেই দেখা হচ্ছে। রি-ইউনিয়নের মতো লাগছে।

—আপনি তো আবার আসানসোলে। স্কুলে তো আসেন মাঝে মাঝে, শুনিনি—দেখা হয় না।

শান্তনু লজ্জিত হবার হাসি রাখল মুখে, কিছু বলল না।

—আসানসোলের খবর কী ?

—ভালোই।

হঠাৎ নিচু স্বরে বললেন, মহাদেব মুন্থার্জি তো এখন আসানসোলে, দেখা হয় ?

—একদিন হয়েছিল।

—কেমন আছেন ?

—ভালোই। তবে তার হাত দুটোর দিকে তাকানো যায় না। পুড়িয়ে শেষ করেছে।

—ওরা তো পোড়াবেই।

—তাই বলে অমন করে পোড়াবে ?

—ওরা কী আর রেখে ঢেকে পোড়ায় ! ওরা দেখা মাত্র সরোজ দত্তকে গুলি করে ।
বাগে পেলো সি.পি.এম.-কে মারে আর হাতে পেয়ে মহাদেব মদুখার্জিকে গায়ে হাত
বুলিয়ে আদর করবে ভাবেন ? যাই হোক, কিছুর কি করছেন তিনি ?

—জানি না ।

—আপনার উপরে আর ঝামেলা হয় না তো ?

—কোন ঝামেলা ?

—ওই ৭০-৭১-এর ? ষাঁটিগলিতে যখন ছিলেন ?

—আপনি জানেন ?

—... । উত্তর না পেয়ে শান্তনু সতর্ক হল । গোমেদ সমেত ডান হাত আবার পকেটে
রাখল । মূখে বলল,

—না, হয় না ।

—আচ্ছা, পরে কথা হবে । ওখানে কোর্টিনস মেমোরিয়াল সোসাইটি আছে তো ?

—জানি না ।

—সে কী ! আচ্ছা ঠিক আছে, পরে কথা হবে । এ সব কথা কিন্তু অরবিন্দর সঙ্গে না ।
কেমন ?

—আচ্ছা ।

শান্তনুর ঘাম দিল । কোথায় এসে পড়েছে আজ ? গোপালবাবু চলে গেলে সেই সন্ধ্যোগে
আবার নিজেকে কিছুর ফাঁকা জায়গায় একা পেয়ে সে পকেট থেকে ডান হাত বের
করল, গোমেদের দিকে তাকাল : কী পারবে না ফর্ম জমা দিতে ? গোমেদ হেসে বলল,
অপেক্ষা কর, সব পারবে ।

শান্তনু অপেক্ষা করল । বেশিক্ষণ না । সহসা অবরোধ নড়ে উঠল । গুরুজন শোনা গেল :
এসে গেছে, এসে গেছে ।

অবরোধ ঘন হল । কাউন্সিল অফিস বাড়ির সদর ও দোতলায় উঠবার সিঁড়ির মূখে
অবরোধ বিস্তৃত হল ।

গাড়ি থেকে নেমে কে একজন লম্বা মূখ কালো মানুষ এগিয়ে আসছিল । চোখে বেমানান
চশমা, অথচ কোথায় যেন ডেন্ট কেমার ভাব, মূখে কান্ট হাসি, কাগজে একবার ছবি
বেরিয়েছিল, শান্তনু চিনতে পারল ক্রমে, ডি. এস. গাঙ্গুলি ।

উনি অবরোধের ফ্রন্টে এসে দাঁড়ালেন । তাঁর পিছনে, আশে পাশে একজন পিওন ছাড়া
২ / ৪ জন ভদ্রলোক, তারা খুব বিচলিত । উনি বিচলিত থেকে মূহূর্ত্ত দাঁড়ালেন ।
তাঁর চোখ দুটি লেন্সের ভিতরে চঞ্চল হচ্ছিল । মূখে, লো-ভয়েসে বললেন, ‘এসব কী ?
সরে যান ।’

—না, আমরা সরব না । আমাদের কথা আছে । এখানেই বলব । আপনাকে জবাব দিতে
হবে, এখানেই দেবেন । তারপর যেখানে খুশি যাবেন ।

—এটা জবাব দেবার জায়গা না। আপনাদের মধ্যে যে কেউ একজন আসুন আমার অফিসে। কিছুর পরে আসুন। আমিই ডেকে নেব।...

বলতে বলতে তিনি কাউকে কিছুর বদ্ব্যবহাতে না দিয়ে সকলকে ঠেলে এগিয়ে গেলেন।

ততক্ষণে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির মূখে অবরোধ শব্দে পড়েছে। তিনি কোনো কিছুর দিকপাত না করে এগিয়ে গেলেন। শান্তনু স্পষ্টই দেখল, তিনি শব্দে পড়া টিচারদের হুঙ্কার না করে একজনের বদ্ব্যবহা বন্ধের উপর দিয়ে ডিঙিয়ে, তেমন করে বোঝা না গেলেও মনে হল একজনের হাত মাড়িয়ে হন হন করে ওপরে উঠে গেলেন। যার হাত মাড়ানো হল, সে আতর্জনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অবরোধ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। প্রায় সবাই চীৎকার করে স্লোগান দিতে দিতে ওপরে উঠে গেল। শান্তনু প্রায় একা দাঁড়িয়ে রইল। তার বুক টিপ টিপ করছিল। সে আর পকেট থেকে ডান হাত বের করতে পারল না। তার হয়ে গেল। অ্যাপ্রিকেশন ফর্ম জমা দেয়া দূরের কথা, মনে হল বিপদ আসল। তার কেটে পড়াই ভালো। পরে আবার এসে অবস্থা বোঝা যাবে। তখন ওপরে তুমুল হটগোল। চেয়ার-টোবল সরানোর মূহুর্মূহু আওয়াজ। শান্তনুর আর পালানো হ'ল না। কোথা থেকে যেন ১৯৬১-র ট্রাম মডেলের সাউন্ড পেল সে। তার রক্ত চঞ্চল হল। সে এই প্রথম গোমেদের উপর নির্ভরতা হারাল। বোঝা যাচ্ছে, গোমেদ একা কাজ করে ভালো। সমাবেশে বা কোনো গ্যাদারিং-এ গোমেদ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

কোথা থেকে যেন ক্রোধ আসছিল। যেন মনে হচ্ছিল, তার এই ডান হাতই মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল ওই ডি. এস. গাঙ্গুলি। হাত টনটন করছে। হাত নিশাপাশ করছে। হঠাৎ ইচ্ছা হল সে গোমেদ খুলে তার খালি আঙুলগুলো একবার দেখবে, যা তার নিজস্ব। সে ডান হাত পকেট থেকে বার করল। গোমেদ কেমন মাটি মাটি রঙের হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে লুকোতে চাইছে যেন। যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়। আর সেই বরাভর নেই। সেই ব্রাইটনেসও নেই। গেল কোথায়? লোক দেখে ভয় পেল নাকি? আসলে রাহুর তো গলা কাটা। ক্রোধ আছে খোলো আনা, কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে যা কিছুর গলে কাটা গলা দিয়ে বোরিয়ে যায়। গ্রহণ হয়, গ্রহণ ছাড়ে। ধরে রাখতে জানে না রাহু। গলা কাটা যার, তাকে আবার ভয় কী?

সহসা ছুটতে ছুটতে অরবিন্দ এল। সঙ্গে সঙ্গে শান্তনু ডান হাত পকেটে ঢোকাল।

—এ কী তুই এখানে দাঁড়িয়ে? ওপরে তুলকালাম কাণ্ড ঘটছে। শুনছি, পদলিখ আসবে। তাই নিচে নেমে এলাম। তুই সঙ্গে থাক।

ততক্ষণে ওপর থেকে আরও কয়েকজন এসে গেল।

সবাই মিলে রাস্তায় দাঁড়াল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পদলিখ ভ্যান এসে গেল।

অরবিন্দ ছুটে গেল ভ্যানের কাছে। কী সব যেন বলল, নিচু স্বরে। মন্ত্রের মতো কাজ হল। নেহাত ভালো মানুষের মতো একজন পদলিখ অফিসার ভ্যান থেকে নামলেন।

অনুগত হয়ে অরবিন্দর পিছু পিছু ওপরে উঠতে লাগলেন। অরবিন্দ একবার শূন্য শান্তনুকে বলল, ‘আমি আমার সঙ্গে।’ শান্তনুও ওপরে উঠে গেল। মনে পড়ল, অরবিন্দ সি. পি. এম. করে। এ রাজ্যে অন্তত রাজার জাত। ওর সঙ্গে যাওয়াই নিরাপদ। এখন ও-ই রক্ষা করতে পারবে। গোমেদ এখন ইনঅ্যাকটিভ। অরবিন্দই অ্যাকটিভ এখন। তার সঙ্গে নেয়া ছাড়া আপাতত শান্তনুর উদ্ধার নেই।

ওপরে উঠে ভীড়ের মধ্যে পদূলিগ অফিসারকে নিয়ে অরবিন্দ যে কোথায় গেল টের পেল না। নিরাপত্তার অভাব হচ্ছে বুঝে সে অরবিন্দকে খুঁজতে এদিক-ওদিক গেল।

এক সময় সে হঠাৎ এক প্রায় ফাঁকা ঘরে নীরবে চেয়ারে বসে থাকা দুজন ভদ্রলোককে দেখল। তার মধ্যে একজনকে চিনল। গতকালের রিসার্ভিং সেকশনের ডিভিং ক্লাক। তাকে দেখে তার সন্মিত হ’ল। সে চলে যাচ্ছিল, বলা যায় প্রায় পালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু যেহেতু সে একা, যে জন্য গোমেদ আবার সক্রিয় হল, সেই ক্লাক তাকে ডেকে বললেন, ‘আরে আপনি? দেখছেন তো কী ঝামেলা। ও বেলা আসুন, আছি, আপনার ফর্ম রিসিভ করব। গোলমাল মিটে যাবে মনে হয়। পদূলিগ এসে গেছে। জ্যোতিবাবুর কাছেও খবর গেছে।’ শান্তনু কোনো কথা না বলে পালিয়েই গেল বলা যায়। তারপর থেকে অসম্ভব সব ব্যাপার ঘটতে লাগল। প্রায় ঘণ্টাখানেক অরবিন্দকে খুঁজতে বারবার ওই ক্লাকের সম্মুখীন হচ্ছিল এবং যখনই তারা দুজনে কোনো ফাঁকা বারান্দার বা করিডোরে, তখনই সেই কথা। ‘ভাববেন না, আমি আপনার ফর্ম রিসিভ করব।’ এরমধ্যে অন্তত ১০৯ বার গোপালবাবু অধীরের সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু অরবিন্দর সঙ্গে তখন পর্যন্ত একবারও না। অথচ যত বার গোপালবাবু বা অধীরের সঙ্গে দেখা, ততবারই শান্তনু ডান হাত পকেটে লুকোচ্ছিল। আর তারপর যতবার সুযোগ মতো ডান হাত বের করে ফাঁকে দেখাচ্ছিল গোমেদ, ততবারই সে, ওই গোমেদ আরও রাইটনেস হারাচ্ছিল। আবার যতবার সেই ক্লাকের সঙ্গে দেখা, ততবার ডান হাত সে প্রকাশ্যে রাখাচ্ছিল। দেখাচ্ছিল অবাধ হয়ে, গোমেদের রাইটনেস ফিরে আসছে। এ যেন ইন্দুর-বেড়াল খেলা। যেন গোমেদ বলছে, তুফান যাও, একা অপেক্ষা কর। কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। দেখা হয়ে যাচ্ছে গোপালবাবু বা অধীরের সঙ্গে। এ সময় সে কয়েকবারই ভেবেছিল, দুলালের দেওয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণাদির ফোন্ডারটি বের করে একবার প্রত্যক্ষ করবে কি না, পারেনি, কেননা যাকে একা হওয়া বলে বাস্তবিক সে সেরকম একা হতে পারছে না।

প্রায় যখন সবকিছু শান্ত, প্রায় সবাই যখন আবার নিচে, শান্তনু তখনো ওপরে গোপালবাবু ও অধীরের পাশে। আর তাদের কাছ ছাড়া হয়নি শান্তনু। পারেও নি কাছ ছাড়া হতে। তারা তাকে আগলে ছিল বলা যায়।

এক সময় অরবিন্দর দেখা মিলল। সোজাসে তাকে, অধীরকে, গোপালবাবুকে আশ-পাশের সকলকেই সে বলল, খুব জশ্বদ হয়েছে ডি. এস. জি.। আজ অফিস স্ট্রাইক। ওরা আমাদের সমর্থন করছে। চলুন আমরা সব নিচে যাই। এই অফিসের সবাই কাজ

বন্ধ করে নিচে আসবে। নিচে নামতে নামতে শান্তনু তার পকেটে লুকোনো ডানহাতের আঙুলের গোমেদ অন্যান্য আঙুলের দ্বারা বন্ধুতে চাইল। বন্ধুতে পারল না। এমন পজিশন ছিল পকেটে যে অন্যান্য আঙুলগুলি খুঁজেই পেল না গোমেদের আঙুল। তখন শুরুর হল স্লেগান, আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে... ডি. এস. জি.-র হিটলারি কালো হাত ভেঙে ফেল, পদ্মিড়িয়ে ফেল... হায়ার সেকেন্ডারির আলাদা স্ট্যাটাস দিতে হবে। দিতে হবে... হায়ার সেকেন্ডারির আলাদা পে-স্কেল এখুনি ঘোষণা করতে হবে... কলেজ ও স্কুলের দু-নৌকোয় পা দিয়ে চলব না... চলব না।'

স্লেগান যেমন হয় তেমনি তালে তালে ট্রেড-ইউনিয়ন বা ছাত্র-ইউনিয়নের মতো জঙ্গী ও যুবো হয়ে হো-চি-মিন সরিণ ও অফিস বাড়ি কাঁপিয়ে দিল। স্লেগান খুব সংক্রামক। অরবিন্দ লীড করছিল, অধীর প্রথমে গলা মেলায়নি। কিছু পরেই গলা মেলাতে বাধ্য হল, কেননা তার পাশেপাশে কেউ বাদ ছিল না। গোপালবাবু দূরে ছিলেন কিছু। অধীর ডেকে আনল। অরবিন্দ এগিয়ে গোপালবাবুর কাঁধে হাত দিয়ে স্লেগান তুললে— গোপালবাবুর উপায় রইল না আর। তিনিও গলা মেলালেন। শান্তনুর চোখের সামনে ঘটে গেল এই ঘটনা। ১৯৬২-র পর সব কমিউনিস্ট একই স্লেগানে গলা মেলাচ্ছে, একই মেঝের উপর দাঁড়িয়ে আছে, ভাবা যায় না, যেন সমুদ্র ফেটে পড়বে, যেন এখুনি শান্তনুর চোখ দিয়ে প্রথম জল বেরুবে, যে জলের ধারা যেন অবিরাম হবে ও ধূয়ে মূছে যাবে সব ভুলগুলি। উৎসাহ ও আনন্দে অস্থির শান্তনু কিছু উচ্চ স্বরেই গলা মেলাল। তার ডান হাত তখন পকেটে! বের করার উপায় নেই তখন। কিন্তু পকেটের ভেতর সেই হাত যেমে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই অ্যাগ্রিকেশন ফর্ম। নষ্ট হতে দিল সে। কিন্তু ডান হাত জমে যাচ্ছে পকেটে থাকতে থাকতে। সে বার করতে চাইল। কিন্তু এখানে গোমেদ বার করা যায় না। প্রকাশ্যে এই জনসমক্ষে সে, গোমেদ, লজ্জা পাচ্ছে। সে তাই পকেটে দুলালের সেই রামকৃষ্ণাদির ফোল্ডারের সঙ্গে মাটির মতো মিশে আছে। অন্ধকারে। নিশ্চয় সে দৃঃখ পাচ্ছে। কেননা আর তার কোনো অ্যাকশন নেই এখন, ফর্ম নষ্ট হয়ে গেছে। সে পকেটের ভিতর অন্যান্য আঙুলের সাহায্যে খুলে ফেলল গোমেদ।

তারপর স্মার্টলি বার করল তার মৃত্ত ডান হাত। □